সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৪
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক নির্মাতা
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯।

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার
শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ

প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য এবং চারিত্র ৯
বিচ্ছিন্নতা ও সুধীন্দ্রনাথ ২৪
সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে আবেগ, প্রেরণা ও যুক্তিজাল ৩২
সুধীন্দ্রনাথ, মালার্মে ও মধুসূদন ৪৩
একরূপতা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি কবির টান ৫০
সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি ৫৬
সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনা ৬৫
সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা ৭২
ক্ষণবাদী সুধীন্দ্রনাথ ৭৬
সুধীন্দ্রকাব্যে প্রেম ৭৮
প্রতীক চেতনা ৮১
অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ ৮৬
শাব্দিক সুধীন্দ্রনাথ ৮৯
সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ, মিল ও অলঙ্কার ১১৩
অলঙ্কার-ব্যবহার ১১৮
সুধীন্দ্রনাথ কি ক্লাসিসিস্ট ? ১২২
অর্কেস্ট্রা ১৩১
ক্রন্দসী ১৪৭
উত্তরফাল্গুনী ১৬০
সংবর্ত ১৬৭
দশমী ১৮০
পরিশিষ্ট

ভূমিকা

বাংলা কাব্যে সুধীন্দ্রনাথের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের চেষ্টায় যাঁরা ব্রতী—তাঁদের শ্রদ্ধা-বিগলিত আলোচনায় কবির কাব্যোপলব্ধি পাঠকের পক্ষে সহজ হয়েছে বলা চলে না। কখনো ভক্তির আধিক্য, কখনো বিদেশী সাহিত্যের বিবিধ আন্দোলনের আলোচনা এবং সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত বিশেষণের ব্যবহার (যেমন, তিনি ধ্রুপদী, নিরাশ্রয়ী, নৈরাশ্যবাদী, নেতিবাচক, ক্ষণবিশ্বাসী জীবনদর্শনের ধারক ইত্যাদি) তাঁর কবিতাকে বোঝবার পক্ষে কতদূর সহায়ক হয়েছে—তা ভাববার কথা।

সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুবাৎসল্যের তুলনা মেলা ভার। তিনি ধনী, সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ, অসাধারণ দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, অমায়িক, সুভদ্র; সংস্কৃতি-জগতের মধ্যমণি হিসাবে পরিগণ্য; এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে নিজের সাংস্কৃতিক জগতে নিজের ভাবনালোকে একক বন্দীদশা ভোগ করে গেছেন। তার বন্ধু বাৎসল্যের প্রসন্ন পুরস্কারলাভের সৌভাগ্য যে ক'জন অঙ্গুলিমেয় মানুষের জুটেছিল—তাঁরা তাকে বড় বলে জেনেছেন, কাছের মানুষ হিসেবে তাঁর প্রাত্যহিক সত্তার ব্যাবহারিক পরিচয় জানার সুযোগ তাঁদের নিশ্চয়ই হয়েছে, এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁর কবি-জীবনের দু একটি দুর্জ্ঞেয় দিকের সূত্রসন্ধানও বোধহয় পেয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর রচনাই শুধু পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে কবির ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গতা বিষয়ে আন্ত-রিক কথা বলা যেমন অনধিকার চর্চা বলে মনে হয়, তেমনি যাঁরা সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলার এক মেজর কবি, তিনি মহৎ, তিনি শব্দশিল্পের এক বিচক্ষণ জহুরী—ইত্যাকার উক্তি করে এবং এই উক্তির আলোকে তাঁর কাব্যকে বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র গুণকীর্তন করেন, তাঁরা বোধহয় কিছুটা তাঁর কাব্যের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা বলেন না। তাঁদের কাছে কি আমরা দাবি করতে পারি না যে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের মাহাত্ম্য কোথায়—তা বুঝিয়ে বলতে হবে, কেন পাঠকের অন্তর্লোকে তাঁর কাব্য নতুন বৈশিষ্ট্যের আনন্দ এনে দেয়—সেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত গুণকীর্তন আছে—তাঁর কাব্যের বিশ্লেষণোত্তর উৎকর্ষ নিয়ে তত আলোচনা নেই। তবে চিরকালই সাহিত্যের কিছু সৎ পাঠক থাকেন, তাঁরা

নিজেদের চেষ্টায় স্বকীয় বোধের তরণীর সাহায্যেই ধীরে ধীরে সুধীন্দ্র-সমুদ্র পার হতে প্রয়াসী হন। সেই সমুদ্রাভিযান কারুর কাছে অভিরাম ঠেকে, কেউবা তরঙ্গ-সঙ্কুলতাকে দুরূহ ভেবে ভগ্নোৎসাহ হয়ে অভিযানে ছেদ টানেন। এই কারণেই আমার মনে হয় সুধীন্দ্রনাথ 'ভালো' এবং 'তেমন ভালো নয়, দুরূহ' বলে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণে চিহ্নিত। কাব্যরসিক সমালোচকের উচিত কাজ ছিল সুধীন্দ্র-নাথের উৎকর্ষ কেন এবং কোথায়, কোথায়ই বা তিনি দুরূহ ও দুর্বোধ্য তার বিশ্লেষণ করা, সুধীন্দ্রনাথ কোথায় রসোত্তীর্ণ, কোথায় আড়ষ্ট, কোথায় উপমা রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারে উদ্দীপ্ত, আর কোথায়ই বা দুর্বোধ্য অপ্রচল শব্দের ভারে ন্যুব্জ—তা বুঝিয়ে বললে তাঁর পাঠকবর্গের উপকার করা হতো সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অনেক সমালোচকই বন্ধুকৃত্যমানসে তাঁর কাব্যের গুণকীর্তন করতেই উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্টের তাবৎ প্রতিশব্দ-বিশেষণ খরচ করে নিঃস্ব বা নিঃশেষ হয়েছেন, এতে তাঁর কাব্যের সম্যক্ আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। পেশাদারী বক্তা যেমন কোনো কবি সম্পর্কে সভায় কিছু বলতে উঠলে অভিধানের যাবতীয় গুণবাচক বিশেষণ উল্লেখ করবেনই সেই কবি সম্পর্কে—তা তিনি রবীন্দ্রনাথই হন আর হরিপদকেরানীকল্প কবিই হোক! বহু সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রযোজ্য বিশেষণ কি আমরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনার অধিকারী কবির প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে শুনি না? সেই রকম কোনো কবির কবিতার আলোচনায় বিশেষণ বাহারের ও ব্যব-হারের কোনো বাছবিচার চলে না তাই রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ একীভূত হন—ভালো ত' ভালোই!

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নির্দোষ—একথা যেমন বলা চলে না তেমনই সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিকুলের শিরোমণি—এমন একটা মন্তব্যও বোধহয় সমীচীন নয়। কবির স্থান ঠিক কোথায়—এবং বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে তার রচনার স্বরূপ কি—তার যথার্থ মূল্যায়ন দরকার। আমি কাব্যের দিকে তাকিয়েই, ব্যক্তি মানুষটির স্নেহবৎসল সত্তাকে বিস্মৃত হয়েই সুধীন্দ্রনাথের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আর সেই আলোচনা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ীই হবে, কেননা বিজ্ঞতার বা মনীষিতার উজ্জীবনের গর্ব আমার নেই; নিতান্ত সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতেই সুধীন্দ্রনাথের কবির স্বরূপ উদ্ঘাটনেই আমার ভাষ্য সীমাবদ্ধ।

একথা ঠিক যে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ক'টি চালু বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—তার আওতায় যে কবি পড়েন না এমন নয়। এক এক ক'রে সেই বিশেষণগুলি বিচার করলে সুধীন্দ্রনাথের কবি-মানসের পরিচয়ের কয়েকটি দিক উদ্ঘাটিত হবে

বলে বিশ্বাস করি। তাঁর সম্পর্কে যে বিশেষণটি খুব বেশী চলে—তা হলো তিনি নৈরাশ্যবাদী।

তাঁর কাব্যে নৈরাশ্য অক্টোপাশের মতো বহুধাবিস্তৃত হয়ে আছে, কখনো স্পষ্টতঃ, কখনো বা সংগুপ্ত অবস্থায়। কিন্তু তা বলে তিনি নৈরাশ্যেরই কবি—এমন বলা চলে না। তাঁর কাব্যে প্রেম আছে, যুগচিন্তা আছে, ক্ষণিক ভোগের বিলাস রয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে নৈরাশ্য থেকে মুক্তির আকুলতাও তাঁর শেষ দিকের কাব্যে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে।

তবে নৈরাশ্য সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি মূল সুর ; ধুয়া বলতে পারলে বোধহয় ভালই হতো। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' থেকেই নৈরাশ্যের পথে তাঁর অভিযাত্রা, নাস্তি-চেতনায় তিনি বিভোর হয়েছেন 'অন্ধকার' কবিতা থেকেই , ঐ কবিতাটির রচনাকাল হলো ৬ই জানুয়ারি ১৯২৬ সাল। এখান থেকেই কবির কাছে জীবন অসহ্য ঠেকছে, জীবনের তরীও 'হালহারা'।

> ভেঙে পড়ে সব বাঁধ ; অভিমান মর্যাদা সাহস
> যত্নে-রচা ঔদাস্যের নাস্তিগর্ভ কঠিন সন্তোষ।
> বিষাক্ত যৌবন ব্যথা, রুদ্ধ-প্রাণ-ধারণের গ্লানি
> সহে না সহে না আর।···
> ·· নেমে আসে নিমীল নয়নে
> জগৎ-দলন শিলা অবসন্ন অশান্ত তন্দ্রার
> নৈরাশনিবিড় হল অখিল অনঙ্গ অন্ধকার॥ (অন্ধকার, তন্বী)

এখান থেকে নৈরাশ্যের অভিযান শুরু। আর সেই অভিযানের আরেক প্রান্ত রয়েছে তাঁর শেষ গ্রন্থ 'সংবর্তের পথ' কবিতায়। মাঝে 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'দশমী' প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক কবিতাই নৈরাশ্যপীড়িত। তাঁর নৈরাশ্যের রূপ, স্বরূপ এবং কারণসূত্র ব্যাখ্যা করার মধ্যেই তাঁর কাব্যালোচনার অনেকখানি বলে আমার মনে হয়েছে, এবং আমি তাই তাঁর চারিত্র এবং নৈরাশ্য দিয়েই আমার গ্রন্থের সূচনা করেছি।

তাঁর দার্শনিকতা, ক্ষণবাদী চিন্তা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ঈশ্বরচেতনা, মৃত্যুভাবনা, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য, তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি প্রভৃতি—সবই আলোচনার বিষয় করেছি।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি স্বতন্ত্র এবং একাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। আমি সে জন্যে তাঁর শব্দ ব্যবহারের বাহাদুরি কোথায়, তার জন্যে বিশেষ আগ্রহী হয়েছি।

তাঁর ছন্দের বৈশিষ্ট্য, অন্ত্যানুপ্রাসের চেহারা, অলঙ্কার-প্রয়োগ প্রভৃতির আলোচনা করে তাঁর কাব্যরীতি কোন্ ধরণের—তিনি রোমাণ্টিক না ক্লাসিসিস্ট—সে কথা বলতে চেষ্টা করেছি। সর্বশেষে গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলীর স্বতন্ত্র কিছু আলোচনার পর উপসংহার টেনেছি।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে অনেকেরই অভিযোগ তিনি দুরূহ এবং অপ্রচল শব্দের বড় বেশী ব্যবহার করেছেন; সেই সব পাঠকের জন্যে আমি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত দুরূহ শব্দাবলীর তালিকা ও তাদের অর্থ দিয়ে দিলাম। কয়েকটি শব্দের অর্থ আমি অভিধান ঘেঁটেও উদ্ধার করতে পারি নি, আপ্তের সংস্কৃত অভিধানেও পাই নি; কয়েকটির অর্থ আমি কবিতার বিন্যাস ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে বুঝেছি, সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেওয়া আছে। সদাশয় পাঠকের কাছ থেকে সঠিক অর্থ যদি জানতে পারি—তবে আমার সংশয় দূর হবে—এই আশা রাখি।

মণ্ডল বুক হাউসের শ্রীসুনীল মণ্ডলের প্রচণ্ড তাগিদের জন্যেই এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে। এই নেপথ্য ইতিহাসটুকু না বললে এই রচনার বিষয়ে বলা সম্পূর্ণ হবে না।

'ছন্দসী'
১০/৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০২৬

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য এবং চারিত্র

সুধীন্দ্রনাথ নিজে বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁর কাব্য 'বন্ধুমহলে দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত', এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে তিনি যে 'অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম' দিয়েছেন, 'বঙ্গ-ভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ।' এই জাতীয় কথার উল্লেখেই তিনি 'স্বগত' গ্রন্থের সূচনা করেছেন।

এ কথার মধ্যে বিনয় কতটা আর কতটাই বা সত্য ভাষণ তথা স্বতোভাষণ—তার বিচার না করেই বলা যায় যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বৃহত্তর পাঠক-সমাজের কাছে দুরূহ এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে, যে পরিশীলিত পরিশ্রমের চাবিকাঠি দিয়ে তাঁর কাব্যের অন্দরমহলের কুলুপ খুলতে হয়—আমাদের দেশের সাধারণ পাঠক এখনো তেমন শ্রমশীল অধ্যয়নে অভ্যস্ত হতে জানে না। তবু সুধীন্দ্রনাথ শুধু যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় অধ্যবসায়ী রসিক পাঠকের মনোলোকে বিরাজ করেই খ্যাতিমান হয়েছেন—এমন ভাবনাও বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ তিনি দুরূহ বলে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতা বোঝবার জন্যে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। তাই তিনি স্বল্প কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হলেও তাঁর পরিধি ছিল একটু বিস্তৃততর। তা ছিল কেন? এই কেন-র উত্তরেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার এবং কাব্য-পরিচয়ের মূল কথা নিহিত রয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-চরিত্রের দৃঢ় প্রতিফলন ঘটেছে—তাঁর কাব্যে। মানুষটি যেমন—বৈভবে-বৈদগ্ধ্যে, প্রেমে-প্রশান্তিতে, বেদনায়-বাৎসল্যে, —যুগধর্মের উত্থানপতনের সংবেদনশীলতায় যে চরিত্র তিনি বহন করেছেন, তাঁর কাব্যে সেই উপলব্ধির বাঙ্ময় অভিব্যক্তি। তিনি যে বারবার বলতেন—অভিজ্ঞতার রূপায়ণেই কাব্যরসায়ন, তা তাঁর

কাব্য-প্রসঙ্গে খুবই স্পষ্ট হয়েছে, তাঁর বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতা—তাঁর রচনাতেই রূপ নিয়েছে। সেই জন্যে এক 'তন্বী' ছাড়া—আর সবগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাতেই বোঝা যায়—মানুষ সুধীন্দ্রনাথ মূর্ত হয়েছেন, এই লেখাগুলি যে তাঁরই—এমন একটা অভিজ্ঞানের শীল-মোহর খোদাই করে দিয়েছেন। এই চরিত্রগুণেই পাঠক-সমাজের শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করেছেন সহজভাবে; দুরূহ হলেও তিনি কারুর অশ্রদ্ধাভাজন বা বাংলা সাহিত্যের অনুল্লেখ্য কবি বলে অবহেলিত হন নি।

সুধীন্দ্রনাথ কবির অভিজ্ঞতার কথা বলেই ক্ষান্ত নন, তিনি কাজে তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধন তিনি ঘটিয়েছেন। যখন তিনি কিছু লিখেছেন—তখনই তিনি নিজের মনের অনুমোদন নিয়েই তা লিখেছেন; কি গদ্য আর কি পদ্য—আত্মজিজ্ঞাসার ছাড়পত্র না নিয়ে নিজের সঙ্গে বাদানুবাদের পর্ব শেষ না করে তিনি কিছু সৃষ্টি করেন নি। এই চরিত্র-রক্ষার জন্যেই তিনি প্রধান কবির দলে অন্যতম বলে গণ্য হয়ে থাকেন। যখন তাঁর মনে হয়েছে জনতার সঙ্গে একাত্মতা করা চলে না—তিনি 'জনতার জঘন্য মিতালি'তে অনীহা পোষণ করে তা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি, আবার এই সব মানুষের সম্পর্কে হতাশও হন নি যখন—তখন তা ব্যক্ত করতেও পশ্চাৎপদ হন নি।

তাঁর কালের যুগকে তিনি যেভাবে বুঝেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই কাল যেভাবে ধরা পড়েছে, তিনি পরম সাহসভরে সেই ভাবে তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে নিজের কাব্যে রূপ দিয়েছেন। যুগের স্বাক্ষরকে তিনি নিজের চিন্তার আলোকে স্পষ্ট করেছেন—'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে' তিনি যে দার্শনিক মতে উপনীত হয়েছেন—তাকে তিনি 'ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ' বলে অভিহিত করেছেন, এবং নিজের কবিতা সম্পর্কে তাই বলতে দ্বিধা করেন নি যে তাঁর রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী। এ শুধু কথার কথা

নয়, এ জন্যে তিনি কবিতাকে মেজে ঘষে স্থায়ী রূপ দিতে প্ররোচিত হন নি, তিনি বলেছেন—'সংস্কারসাধ্য জেনে, কোনও রচনাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আকার দিতে আমার বিবেকে বাধে।' (মুখবন্ধ, সংবর্ত) এই চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়েই সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈভব। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাই ব্যক্ত করেছেন—এবং কবির এই নিষ্ঠাই কবিকে পরিণতি দান করে এবং প্রধান কবির দলে স্থান করে দেয়।

তাঁর কাছে শতাব্দীর অবক্ষয়ী রূপের ক্লিষ্ট ম্রিয়মাণতা বিষণ্ণ ঠেকেছে—এবং অকপটে তাই ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কথা, সভ্যতার প্যাঁচে পড়ে মানুষ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি, নিজের মনীষা ও বিবেকের শ্রেষ্ঠ ফসলের মুখ সে দেখতে পায় না ; তার চারিদিকে অবক্ষয়, চারপাশে নিষ্ফলতার হাহাধ্বনি, বন্ধ্যাজীবনের অশুভ অন্ধকারে সব কিছু গ্রস্ত। রিক্তফসল হেমন্ত এবং নীরক্ত শীতের প্রকৃতি তাঁর কাব্যের পটভূমি, মরুভূমির চিত্র তাই প্রতি গ্রন্থেই প্রাধান্য পেয়েছে, ভাঙা নৌকা আর ফণিমনসা বন্ধ্যাত্ব ও নৈরাশ্যের সূচক বলে তিনি তাঁর কাব্যে এই জাতীয় উপমানকে প্রিয় বলে মনে করেছেন। কি প্রেমের কবিতা আর কিবা জীবনের অন্য বোধের কবিতা—সর্বত্রই শূন্যতার বেদনা, সর্বত্রই নৈরাশ্যের হাহাকার, প্রায় সব কবিতাতেই কবির হতাশার সুর, বন্ধ্যাত্বের নৈষ্ফল্য।

'মাধবী পূর্ণিমা' রাত বর্ণনা করতে গিয়ে কবির মনে পড়ে—

কবিত্ব আমার ধর্ম, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা॥

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অন্বিষ্ট আমার ;
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সে-সবে এ-হৃদয় উদাসী,
উত্থান পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার॥

বিচ্ছেদ-বাদল-রাতে মিলেছিল যে-শেষ চুম্বন,
রাকারে বিফল করে আজও তার নশ্বর স্মরণ ॥

(মাধবী পূর্ণিমা, উত্তর ফাল্গুনী)

প্রেমিকার মধ্যে তিনি মরজগতের ক্ষণিকাকেই দেখেন,—ক্ষণবাদ নৈরাশ্যের একটা রকমফের—অন্তত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে—তাই দেখা যাবে। তিনি অতি সহজেই বলতে পারেন—

হে মোর ক্ষণিকা,
তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।

(মূর্তিপূজা, অর্কেস্ট্রা)

কবির কাছে সবই ক্ষণিক, সুতরাং সবই শূন্য—

প্রযত্ন নিষ্ফল।
বৈনাশিক বুদ্ধি হানে করাঘাত ভঙ্গুর কবাটে ;

সমস্বরে শূন্যবাদ দেখায় প্রমাণ
আকস্মিক সে-বিস্ময় আপতিক অধৈর্যের দান,
নাই তাতে তিলার্ধ নির্দেশ—
অমর্ত্যের উপাদানের বিরচিত নয় সে-আবেশ।

(উদ্‌ভ্রান্তি, অর্কেস্ট্রা)

'ক্রন্দসী' গ্রন্থের অতি বিখ্যাত 'উটপাখী' কবিতাতেও একই সুর। অন্যান্য কবিতাতেও নৈরাশ্যের ছায়া—

এ-জিষ্ণু সেনার পাছে, জানি জানি, আজিকার মতো
ভ্রমিবে কবন্ধযূথ, অন্ধকার, ত্রস্ত বিভীষিকা,
নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার, শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কালশেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিষ্কারণ অতৃপ্তিযন্ত্রণা
ক্ষুব্ধ আত্মধিক্কারের ধূমাঙ্কিত, খিন্ন তুষানল।
পলক ফেলার আগে সে-নবীন বিজেতার দল

পঞ্চ বৎসরের শেষে বিনাবাক্যে হবে অন্তর্ধান
আসন্ন আঁধারে পুন।

(বর্ষপঞ্চক, ক্রন্দসী)

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া, শবের সংসর্গ এবং 'শিবার সম্ভাব' 'নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া'। স্বপ্নেই আমাদের তাবৎ সুখের ছবি, 'জাগরণে আমরা একাকী'।

যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥

(নরক, ক্রন্দসী)

এই কারণেই সুধীন্দ্রনাথের মানসে নরকের ছবি জেগেছে, প্রকৃতির ধূসরতাকে তিনি এঁকেছেন, হেমন্ত ঋতুর রিক্ততা তাঁর বর্ণিতব্য হয়েছে। তিনি দেখেছেন বমন-বিধুর তাঁর অনাত্মদেহকে নরকে পড়ে থাকতে, রাত্রির উপমা দিতে তিনি দুর্গমতীর্থের পথে সঙ্গীহীন বয়ঃস্ফীত বারাঙ্গনার কথা ভেবেছেন। জরাগ্রস্ত রূপোপজীবিনী যেমন অব্যর্থ ক্ষয়ের চিহ্নকে প্রসাধনের সামগ্রী দিয়ে ঢেকে ফেলার চেষ্টায় মাতে, হেমন্ত সন্ধ্যারও যেন সেই দশা। চারিদিকে মরুভূমির ধূসর রিক্ততা, কণ্টকিত ফণিমনসার অবস্থিতি, প্রেতায়িত পরিবেশ,—সব কিছুতেই নাস্তির বলয়-গ্রাস। কবি নদীতেও যেমন সেতু ভেঙে পড়তে দেখেছেন, তেমনি তিনি লক্ষ্য করছেন—নগরে নগরে মরুর অস্তিত্বও খুব বেড়ে যাচ্ছে, দীপাধারেও পশুর দুর্গন্ধ মেধ। তিনি বুঝেছেন—

বৃথা স্বপ্ন; সংকল্প অক্ষম;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিংবা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস,

কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে, নাক্ষত্রিক সহযাত্রিগণ
সে-অপচারীকে ভুলে ছোটে লোকাতীতে ;
নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ
রোমন্থ বিস্বাদ,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,
অভিজ্ঞান
শকুন্তের স্পর্শকলুষিত।

(সংবর্ত)

এই জন্যেই তাঁর কাব্যে শবের উল্লেখ, 'শটিত' বিশেষণের প্রয়োগ, মরুর নিষ্ফলতা ও ভগ্ন বা মগ্নতরীর চিত্র। নৈরাশ্যের সঙ্গে জড়িত যে বিবিক্তি, অবসন্নতা, ক্লিষ্টতা, ক্লান্তি প্রভৃতি শব্দগুলিও কবি বার বার ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভগ্নতরী বা মগ্নতরীর চিত্রকল্প ব্যবহারের পেছনে মালার্মের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেকেই, কিন্তু তাঁর হতাশাপীড়িত জীবনবোধ এবম্বিধ চিত্ররচনার উৎস হতে বাধা কোথায়—সে দিকটাও ভেবে দেখা দরকার। কবির জীবনচিন্তার মধ্যেই এই শূন্যতা ও নৈরাশ্যের বেদনা—তা প্রকাশ করাটাই তাঁর চারিত্রিক সততা—এটুকু মেনে নিলেই তাঁর নৈরাশ্য-বলয়ের একটা সূত্র-সন্ধান ঘটবেই !

সুধীন্দ্রনাথ বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবেও আশানুরূপ উৎফুল্ল হতে পারেন নি, নব বসন্তের রঙীন প্রভাতেও তিনি রিক্ততা উপলব্ধি করেছেন, মনে জমেছে ধ্বংসজনিত নৈরাশ্য, কালিমা-ক্লিষ্ট নিঃস্বতা।

আজি নব বসন্ত প্রভাতে।
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ তাহাদের স্থবির প্রয়াণ
মোর স্তব্ধ যৌবনেরে দিয়ে গেছে বিনষ্টির দান
ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট, নগ্ন, নিঃস্ব বৈধব্যে গোপন ॥

(বর্ষপঞ্চক, ক্রন্দসী)

'উজ্জীবন' কবিতায় কবি যীশুকে সম্বোধন করেছেন, যিনি নিজের জীবন দিয়ে সভ্যতার পাপকে দূর করতে চেয়েছেন, মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই পবিত্র যীশুর আবির্ভাব এবং আত্মদানও ব্যর্থ—সে কথা ঘোষণা করতে সুধীন্দ্রনাথ দ্বিধা করেন নি, অর্থাৎ নৈরাশ্য পীড়নেই তিনি কল্যাণ ও সুন্দরের আদর্শকে মূর্ত দেখতে পাচ্ছেন না। পরাজিত প্রার্থনাকারী আজ মুক্তিব্যাকুল, কিন্তু তাদের প্রার্থনা ব্যর্থতার পরিহাস হয়ে তাদেরই বুকে বাজে—

ওই শোনো,
নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর, শোনো ;
অতিদৈব দেউলের প্রতিধ্বনিপ্রহত গম্বুজে
উদয়াস্ত তোমাকেই খুঁজে
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাস-রূপে
সাংকেতিক যূপে
বিনা রক্তে হয়ে গেছে বলি
ইতিমধ্যে কত শত পরাণপুত্তলি ঃ
আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই ॥
(উজ্জীবন, সংবর্ত)

সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য কত গভীর এবং নিবিড়—তা তাঁর নিজের ঘোষণাতেই বার বার ধরা পড়েছে ; তিনি বলেছেন—'জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া।' তিনি আরো বলেছেন—

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই

জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥
(নরক, ক্রন্দসী)

নৈরাশ্যের মেঘ জীবনাকাশের সমস্ত নীলিমাকে আবৃত করে ফেলেছে—
বিক্ষিপ্ত নৈরাশকণা পুঞ্জীভূত হয়ে ঘন মেঘে
হানিছে জীবনাকাশে বিরঞ্জন আঁধার সমতা।
(পরাবর্ত, ক্রন্দসী)

এই নৈরাশ্যের বেদনায় রিক্ত হয়ে কবি প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন, তার ফলে প্রকৃতির বর্ণাঢ্যতা তাঁর কাব্যে আসন বিছোয় নি, তিনি হেমন্তের শূন্যতাকেই বর্ণনীয় ভেবে নিয়েছেন এবং এই সূত্র ধরে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের গভীর যোগ দেখেছেন এবং কাব্যেও মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু প্রধান কবিদের মধ্যে মিল প্রায়শঃ থাকে না ; জীবনানন্দকে আমরা সৌন্দর্যের কবি তথা প্রকৃতির কবি বলে চিহ্নিত করতে পারি, সুধীন্দ্রনাথকেও বলতে পারি—তিনি সভ্যতার কবি, নাগরিক কবি। সুতরাং উভয়ের পথ ভিন্ন, প্রকরণও ভিন্ন হতে বাধ্য। তবু এক জায়গায় সামান্য একটু মিল দেখতে পাওয়া যাবে—অন্তত নৈরাশ্যপীড়িত মানসের প্রকাশে। জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ—উভয়েই নৈরাশ্যপীড়িত। এই নৈরাশ্যপীড়নের মধ্যে জীবনানন্দ প্রকৃতির শ্যাম স্নেহের দ্বারা লালিত, তিনি প্রকৃতি আশ্রয়ী, প্রকৃতি-প্রেমিক। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে নগর জীবনের উচ্চ কলরোল, প্রকৃতি-প্রীতি অপেক্ষা নাগরিক সংস্কৃতিতেই আশ্রয়ী। জীবনানন্দ দেশীয় এলায়িত ভাষায় ভাব ব্যক্ত করেন, সুধীন্দ্রনাথ তৎসম শব্দের সেবক, গাম্ভীর্যের অনুসারী। কিন্তু উভয়েই নৈরাশ্যকে ব্যক্ত করেছেন মুক্ত কণ্ঠে। জীবনানন্দ তাঁর মানসিক ক্লান্তি, বেদনা ও নৈরাশ্যের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, করেছেন সুধীন্দ্রনাথও ; ক্লান্তি অপেক্ষা নৈষ্ফল্যই সুধীন্দ্রনাথে স্থান পেয়েছে বেশী। উভয় কবির ঋতু তাই

হেমন্ত, যা রিক্ততার ও নৈরাশ্যের প্রতীক। অবশ্য উভয়ের নৈরাশ্য-লালনের কারণটা ঠিক এক নয়। জীবনানন্দ যখন অনন্বয়পীড়িত, সুধীন্দ্রনাথের মনে বিচ্ছিন্নতা বাসা বাঁধলেও তিনি সমকালীন যুগের অন্ধ আবহাওয়ায় কাতর, যুদ্ধের নান্দীরোলে ক্লান্ত, এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো স্বপ্ন রচনায় বিমুখ। তাছাড়া, কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি মনের কোনো প্রেরণা অনুভব করতেন না, কাব্য রচনার ক্ষেত্রে শুধু শ্রমসাধ্য অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির অনুশীলন যথেষ্ট বলে ভাবতেন। তাই বলছিলাম যে জীবনানন্দের সঙ্গে যেমন নৈরাশ্য ও বেদনা-প্রকাশে তাঁর মিল, তেমনই নৈরাশ্য ও বেদনার কারণের সূক্ষ্ম বিচারবোধে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি।

সুধীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তিনি 'বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী, জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন'; 'বিনষ্টের চক্রবৃদ্ধি' তাঁকে বেদনা দিয়েছে, তিনি হারিয়ে ফেলেছেন 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস'। বিংশ শতাব্দীকে যখন থেকে তিনি বুঝতে শিখলেন, অর্থাৎ যৌবনোন্মেষের প্রথমে—তাঁর কিশোর বয়সেই প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু, মানুষে মানুষে হানাহানি, তারপর পৃথিবীব্যাপী মূল্যবোধের ওলোট পালোট—এসব সম্পর্কে যখন তাঁর সম্যক্ ধারণা হলো—তখনই তিনি নতুন জীবনধর্মে দীক্ষিত হলেন। বিংশশতাব্দীর এই ঘুণধরা সময়ে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণব্রত, মানব মহত্ত্বের বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অর্চনা—সনাতন ভারতবর্ষের পূত চরিত্রের অনাবিল ভাবমূর্তির একটা চেহারা তৈরি করেছিল; সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সার্বিক কল্যাণবোধ ও সাহিত্য-দীক্ষা থেকে সরে আসতে চাইলেন—নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য গড়ার জন্যে। তাঁর মনে বিংশ শতাব্দীর চেতনা পীড়নের বেদনার সুর তুলেছিল, সেই পীড়নের গণ্ডী থেকে কল্যাণের রাজ্যে উত্তরণের কোনো পথ তিনি দেখতে পান নি, (অবশ্য তাঁর জীবনের অন্তিমকালে আশা-বাদের এক স্তিমিত আলোকাভাসের দ্যুতি দু একটি কবিতায় যে না

এসেছে—এমন নয়, যথাস্থানে—তার আলোচনা করবো), তিনি হতাশ্বাসপীড়িত নৈরাশ্যে আশ্রিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টি, সৌন্দর্য-সাধনা এবং ভারতীয় তপোবনের মাহাত্ম্য নিষ্ঠা থেকে সুধীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, অর্থাৎ রবিরশ্মিতে আচ্ছন্ন হলে নিজস্ব প্রভা কখনোই দ্যুতি বিস্তার করতে পারবে না—এই বিশ্বাসেই তিনি নিজেকে সনাতন আদর্শ থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, এই কথাটা আমি নানা ভাবে একাধিকবার বলার চেষ্টা করেছি।

এর ওপর বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকাল, পাশ্চাত্ত্য কবিদের নতুন শিল্প-চেতনা এবং নঞর্থক জীবনবাদ সুধীন্দ্রনাথকে নৈরাশ্যপীড়িত করে তুলেছে। এর আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যধ্যান ও কল্যাণব্রতের শান্ত পরিমণ্ডল থেকে দুঃখবাদের তির্যক পথে সরে এসে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যলাভ করতে দেখেছি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই দুঃখবাদের তির্যক পথ সুধীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলতে পারে: তিনিও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্তির প্রয়াসে যেমন প্রকরণে নবত্ব আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তেমনি বক্তব্যেও স্বকীয়তার একটা অভিব্যক্তিকে রূপ দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের কাব্যেও মরুর রিক্ততা আছে, অন্তত কিছু কবিতার শীর্ষনামে মরুর উল্লেখ কারুরই দৃষ্টি এড়াবে না। সুধীন্দ্রনাথকে মরুর চিত্র আঁকতে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে। আমরা সব সময় বিদেশী কবির দ্বারাই সুধীন্দ্রনাথের প্রভাবিত হওয়ার কথা বলে থাকি, তাঁর দেশীয় অগ্রজ কবির দ্বারাও যে তিনি প্রভাবিত হতে পারেন—সে কথাটা অস্বীকারই বা করি কি করে?

আসলে সুধীন্দ্রনাথের ওপরে কোনো কবিরই স্পষ্ট প্রভাব পড়ে নি। অগ্রজ কবিদের পরোক্ষ প্রভাব যে তাঁর ওপর কিছু নেই—এমন নয়, তবে তিনি যখনই তা অনুধাবন করতে পেরেছেন, তখনই তিনি সে বিষয়ে সজাগ হয়েছেন, এবং নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, তাই 'তন্বী' গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি নিচের কথাগুলি

বলেও গ্রন্থটিকে গৌরবের সঙ্গে নিজের গ্রন্থ তালিকায় স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন, এবং সে জন্যেই বুদ্ধদেব বসু 'তন্বী'কে সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থমালা'য় সবশেষে স্থান দিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ 'তন্বী' সম্পর্কে বলেছিলেন—"···কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতি-পরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। ওই লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তারিত তালিকা এইখানে দিতে পারলে, হয়তো মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেক-খানি লঘু হত। কিন্তু সে-লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় আনাতোল ফ্রান্সের উপদেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার এক কবিযশঃপ্রার্থীকে বলেছিলেন—'পূর্বগামীর ঋণ কখনও স্বীকার কোরো না। সে-কৌশলে অধর্মের বোঝা তো তিলমাত্র কমবেই না, বরং হারাবে পাঠকের দরদ। পণ্ডিত ভাববে, তুমি করছ তার অখিল বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ ; মূর্খের মনে হবে তার অজ্ঞতা আর তোমার কাছে ঢাকা রইল না।' উপরন্তু আমার অনুতাপে পাঠকের কোনও দাবি নেই, তাতে যাঁর অধিকার, তাঁর ক্ষমায় কিছুতেই বঞ্চিত হব না।"

(ভূমিকা, তন্বী)

এতে বোঝা যায়—অন্যের প্রভাব সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ সতর্ক ছিলেন, তাই তাঁকে একান্ত নিজের মতো করে মনোভাব ব্যক্ত করতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কাল-চেতনা তাঁকে যে উপলব্ধি দান করেছে, তিনি তা নিজের মতো করেই ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্র-যুগের আশা, বিশ্বাস, কল্যাণ ও শুভবুদ্ধির অনিন্দ্য আয়োজন থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে শতাব্দীজর্জর বিষণ্ণতায় কাতর হয়েছেন তিনি—এবং সেই কাতরোক্তি-তেই তাঁর কাব্য মুখর। এ বিষয়ে তিনি নিজের মননকেই প্রাধান্য

দিয়েছেন, নিজের বিশ্বাসকেই নির্ভয়ে ব্যক্ত করেছেন—এবং এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব এবং চারিত্র।

এতক্ষণ যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলাম—সে কথা থেকেই সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যের কারণ কোথায় নিহিত, তার হদিস দেওয়া চলে। পুনরুক্তির তোয়াক্কা না করেই সেই কারণের কথা ব্যক্ত করি। তীব্র গভীর নৈরাশ্যের পীড়নে সুধীন্দ্রনাথের কাব্য মুখর, যদিও শেষ জীবনে তিনি রিক্ততার বেদনা থেকে উত্তরণের জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন, এবং শ্রেয়োবোধে উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন—তবু নিখিল নিবিড় নৈরাশ্যই তাঁর কাব্যের যথার্থ ধুয়া। এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই, এবং তাঁর চারিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত বোধের প্রচুর উদাহরণ দিয়ে তা বোধহয় প্রমাণে সক্ষম হয়েছি।

কিন্তু কেন এই নৈরাশ্য—সে সম্পর্কে এবার দু একটি কথা বলা যেতে পারে।

আপাতঃদৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথের জীবনে কোনো কিছুরই অভাব ছিল না বলেই মনে হয়, সুস্বাস্থ্য, শোভন রূপ, অমিত বিত্ত, অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং পারিবারিক ঐতিহ্য, সর্বোপরি নিজের আভিজাতিক প্রজ্ঞা-গভীর গৌরব—কিছুরই যাঁর অভাব ছিল না, সেই রকম একজন কবির মনে এমন নৈরাশ্য কেন? এই জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর চট করে মেলে না।

একটা কথা বলা যেতে পারে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে পা বাড়াতে রাজী হন নি, ফলে কল্যাণ ও শুভবুদ্ধির পথকে এড়াতে চেয়েছেন, রাবীন্দ্রিক চেতনায় যে শ্রেয়োবোধ উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তিমান হয়েছে, সেই প্রভা থেকে, সেই মাঙ্গল্যের দীপ্তি থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় বিমুখ করেছেন—এ তাঁর শিল্পী সত্তার দ্রোহ। ফলে বিশ্বাস, কল্যাণবুদ্ধি এবং শ্রেয়োবোধ তাঁর কাব্যে শিকড় বিছোতে পারে নি; তাঁর মনে নৈরাশ্যের বীজ উপ্ত হয়েছে।

তাঁর মনে যুগধর্ম এই বীজ বপন করেছে। তিনি বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী, তাঁর জন্মলগ্নেই বিশ শতকের শুরু। তাঁর কিশোর জীবনের শেষে প্রথম যৌবনোন্মেষের কালে বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অমোঘ ফলপ্রসূতা কবিকে সুস্থির হতে দেয় নি, বিংশ শতাব্দীতে যতদিন রাজনৈতিক লুব্ধতা থাকবে, এক রাজ্যের ওপর অন্য রাজ্যের লোলুপ দৃষ্টি থাকবে, বশ্যতার জন্যে চক্রান্ত, অধিকার রক্ষার কৌশলে মত্ততা—এসব কবিকে পীড়িত করে থাকবে। 'ব্যোমযান, কামান, পদাতি যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়—ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা যার মুখ্য অবলম্ব—সে রাজ্যের সন্ধানে কবি বিমুখ হচ্ছেন, যেখানে কানন শ্বাপদসঙ্কুল নয়—তেমন সুস্থ উদ্যানের জন্যে তার অভীপ্সিত মানস ব্যর্থ হয়ে মরেছে। কবি যখন সৃষ্টিশীল ক্ষমতার তুঙ্গে—তখন আর এক যুদ্ধ মুখ ব্যাদান করেছে, তখন—

বৃথা স্বপ্ন ; সংকল্প অক্ষম ;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিংবা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস
কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে, নাক্ষত্রিক সহযাত্রিগণ,
সে-অপচারীকে ভুলে, ছোটে লোকাতীতে ;
নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ,
রোমন্থ বিস্বাদ,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,
অভিজ্ঞান
শকুন্তের স্পর্শ কলুষিত। (সংবর্ত)

যে কালের ওপর সাধারণ মানুষের কোনো হাত নেই, যে সময় সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপ বহন করে আনে, সেই যুগে ধ্বংসাত্মক প্রাখর্যে বিহ্বল শিল্পী মানসের বলি হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

নাটকী নায়করূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে ;
ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথ সমর ;
মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর,
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে।

(কঞ্চুকী, সংবর্ত)

সভ্যতার নগ্ন আদল রূপে সুধীন্দ্রনাথ খুশি হন নি—হতে পারেন নি বলে, সভ্যতার পেছনে শোষণকে দেখেছেন, অকল্যাণকে দেখেছেন, ফলে সত্য, শিব ও সুন্দরের সান্নিধ্যলাভের ব্যগ্রতা তাঁর মধ্যে জাগে নি, সভ্যতা যে মানুষের আশাকে গুঁড়িয়ে দেয়—এ বিশ্বাসে তিনি পোক্ত হয়েছেন। ‘চিরকালের কীর্তি স্তম্ভগুলোকে ভেঙে চুরে সভ্যতার স্টীম্ রোলর আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর ক'রে কবি আছে সৌন্দর্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা ; যাদের জন্য তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টার ত্রুটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে-গান হয়তো আনন্দের নয়। তাই কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ, ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিযে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ে প্রখর কোলা-হল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য ; রাহুগ্রস্ত হলেও, সে আমাদের নমস্য।

অনেকে বলবেন আমি একটু বাড়াবাড়ি করছি ; এবং কাব্য যদি আসলে আর্ট হয়. তবে বেষ্টনীর বৈরিতায় তার আশঙ্কা নেই। এ-মত একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কেন না মানুষ ও তার সামাজিক অবস্থার প্রতিকূলতায় আর্ট অসম্ভব বটে, কিন্তু পরিণামে প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে

উঠতে না পারলে, তা নিরতিশয় ব্যর্থ কথাগুলো যে নিতান্ত নিরর্থ নয়, তার প্রমাণ আধুনিক চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত ; এবং ললিতকলার অন্যান্য বিভাগে যাই ঘটে থাকুক, আজকের চিত্রে ও সঙ্গীতে বর্তমান সভ্যতার বিকট বিভীষিকাগুলোও যে রূপের আশীর্বাদে বঞ্চিত নয়, তা অবশ্যস্বীকার্য।' (কাব্যের মুক্তি, স্বগত)

সমকাল যে শিল্পীর মানসলোকে কতকটা প্রভাব বিস্তার করে—সে সম্পর্কে তাঁর নিজের এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে যে বিংশ শতাব্দীর বিবিধ সময়ের তাড়না তাঁকে কতদূর বিভ্রান্ত করে থাকবে। তাই বলতে দ্বিধা হয় না যে সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য-চেতনার পশ্চাৎভূমিতে তাঁর সমকালের অবদান কিছু কম নয়। এই অবক্ষয়ী রুদ্র সময় কবির মানসিকতায় একটা অসুস্থ আবহাওয়ার বীজ বপন করতে শুরু করে, আর পূর্বসূরীর দেখানো পথ থেকে সরে আসার বিপ্লবী স্থৈর্য সে বীজকে লালিত করে থাকবে।

সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মানুষ অজানা ভবিষ্যতের পথে অন্ধের মতো এগোচ্ছে, কিন্তু কোথায় এগোচ্ছে – তার হদিস কেউ জানে না, চারিদিকেই 'নিখিল নাস্তির' আড়াল — যে দিকে তাকানো যাক, সুস্থির কিছু চোখে পড়েনা ; এই চৈতন্য মনকে কশাঘাতে জর্জর করে তোলে, বাধ্য হয়েই অন্তশ্চেতনায় নিঃসঙ্গতার বোধ জাগে, কবি নিরাশ হন। কবি নিজের এই চেতনাকে লালিত করেছেন—এর দ্বারাই পালিত হয়েছেন।

বিচ্ছিন্নতা ও সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে বিচ্ছিন্নকার বেদনাও ধ্বনিত হয়েছে। শ্রমশীল মানুষ যখন নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়, —তখনই সে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। নিজের শ্রম পণ্য হয়ে অন্যের কাছে বিক্রীত হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার যে অনন্বিত সম্পর্ক—আসলে রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে তাই হলো বিচ্ছিন্নতার ফল-শ্রুতি। কিন্তু কবি বা সৃষ্টিশীল শিল্পীর ক্ষেত্রে অনন্বয়ের বেদনা আরও ব্যাপক হয়ে বাজে! কবি জীবনের চতুষ্পার্শ্ব থেকে যখন নিজেকে গুটিয়ে নেন, যুগধর্মের হুজুগে যখন যান্ত্রিকতার নির্মমতা সৃষ্টিশীল মনকে পীড়িত করে—নিজের সৃষ্টির আনন্দেও তখন ধ্রুবতা খোঁজা মুস্কিল হয়, যুগের ধ্বংসোন্মুখ শক্তির কাছে মন পরাভব স্বীকার করে সরে আসে, নিজের সংগুপ্ত চেতনায়, কবি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সুধীন্দ্র-নাথের জীবনে নৈরাশ্যের বেদনা, হতাশার পীড়ন, যুগের বিষ নিশ্বাসে কেমন যেন হাঁফধরা ধুকপুকুনি, বিংশ শতকের চত্বরে তিনি চারিদিকে 'সর্বাত্মক বিনাশ' দেখেছেন এবং নিজেকে—নিজের স্বভূমেই পরবাসী বলে ভেবেছেন,—এবং এই ভাবনাই সম্পূর্ণভাবে অনন্বয়ের জনক ও পরিপুষ্টিদাতা। সুধীন্দ্রনাথ লোকালয় অপেক্ষা শূন্য ধূসর রুক্ষ মরুকে শ্রেয় বলে ভেবেছেন, প্রতিবেশীকেও তাই পলায়নতৎপর বলে মনে করেছেন।

> শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমূমে ;
> বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর ;
> পরিত্যক্ত মীনরাজ্য, নিঃসলিল তরঙ্গে ঊষর ;
> নিরিন্দ্রিয় মহাশূন্য, উদাসীন উদ্বায়ী মর্মে।
> অতিকায় কৃকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে ;

প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ ;
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে ;
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ।
নির্বাণ সর্বতোভদ্র : প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে।—অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বগত ॥

(প্রতিপদ, উত্তর ফাল্গুনী)

কবির নাগরিক চেতনায় সভ্যতার কোনো উজ্জ্বল রঙ ধরা পড়ে নি, সভ্যতার বিনষ্টিতে তিনি বেদনাহত বোধ করেন এবং উপলব্ধি করেন —এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ একা, বিশ্বও তার কাছে বিরূপ। 'জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ', নদীতে নদীতে ভগ্নসেতু, আর 'মরু নগরে নগরে।' এই কবির মানসিকতায় তাই অনন্বয়জনিত একটা প্রচ্ছন্ন হাহাকার—

যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—
অপ্রাপ্তসংকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন
দুরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ।

(যযাতি, সংবর্ত)

নিঃসঙ্গ চেতনায়ও সুধীন্দ্রনাথ কাতর হয়েছেন, নিজের বোধ ও বোধির ঘূর্ণাবর্তের জটিলতা থেকে তিনি বেরিয়ে সুস্থ শীতল বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারেন নি কখনো কখনো। নিজের বিষণ্ণ চেতনায় পারিপার্শ্বিক সমাজের ভাঙন এবং বর্তমান জীবনের অবক্ষয়ের চেহারার কথা বলতে গিয়ে কবি সমাজের শূন্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, নিজের করুণ অসহায় অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হয়েছেন, কাতর হয়ে রিক্ততার

বেদনা এবং নৈরাশ্যের যন্ত্রণাকে বাণীরূপ দিতে চেয়েছেন—

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক গোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥

(নরক, ক্রন্দসী)

সুধীন্দ্রনাথের প্রতীক-ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাঁর অনন্বিত মানস কি নিবিড়ভাবে বিচ্ছিন্ন! নিজেকে যখন সমাজ তথা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ভেবে তিনি নিজের চেতনা-লোকে এককভাবে অবস্থান করেছেন—তখনই তাঁর মানসে রিক্ততা, নৈরাশ্য, অন্ধকার ও নির্জনতা ; আর এগুলিকে প্রকাশ করার জন্যে এসেছে রুক্ষ মরুভূমি, রিক্ত ফণি-মনসা, দুস্তর নদীতে একক তরণী প্রভৃতি।

তবে কী বিশ্বাসে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেড়া পাল সযত্নে খাটাই,
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই,
মনে ভাবি
এ-কখানা জীর্ণকাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি
আবার প্রতিষ্ঠা পাবে সপ্তসিন্ধু পারে ?
তার চেয়ে নিঃশঙ্ক সাঁতারে
ব্যয় ক'রে নিঃশ্বাসের অন্তিম সঞ্চয়,
অগাধে সংকল্পসিদ্ধি একাধারে নিশ্চিন্ত, নিশ্চয়॥

স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা ;
জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা
বিজিগীষা।
যে-প্রাক্তন তৃষা
মেটাতে পারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্বাণ হবে তা
জোয়ার-ভাটার সন্ধি নদীবক্ষে, যেথা
মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক,
দুরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক।

(জেসন, সংবর্ত)

সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যভরা শূন্যতাবাদী কবিতাগুলিকেও বিচ্ছিন্নতার কাব্য বলতে হবে। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি দুরূহতাকে প্রশ্রয় দিতেন ঠিকই, কিন্তু বক্তব্যে শটিত শবের পচনশীলতা, জীবনের তমিস্রা-পীড়িত হাহাকার আছে। এই সভ্যতা যে মানুষের কোনো কল্যাণ করতে পারছে না, করতে পারবেও না—তেমন ধরনের একটা ধারণার কথা তাঁর কাব্যে আছে- এবং তা মানব-জীবনের শুভ বোধের ও কল্যাণধর্মের অনুকূল নয়,—তাও সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করতে কোনো দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেছেন—আজকের মানুষের মন বন্ধ্যা, আজকের ধূসর সভ্যতায় মানুষ মাঙ্গল্যের কোনো মূর্তি দেখতে পাচ্ছে না। সে চলেছে এক অবক্ষয়া শূন্যতার পথ বেয়ে—যে পথের ইঙ্গিত সুধীন্দ্রনাথ মরুভূমির ছবির মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন।

তাঁর বহু কবিতার মধ্যেই নিস্ফলা মরুভূমির চিত্র রয়েছে, এবং তিনি এই পৃথিবীকে বিষণ্ণ এবং করুণ বলেই ভেবেছেন। আসলে এই শতকের জীবন যে বিচ্ছিন্নতায় অভিশপ্ত—তা স্বীকৃত সত্য বলেই কবি ধরে নিয়েছেন। বিচ্ছিন্নতার অভিশাপের আঘাতে মানুষ বিপর্যস্ত—এমন একটা উপলব্ধির কথাও পরোক্ষভাবে তাঁর কাব্যে রয়ে গেছে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে আধুনিক সভ্যযুগ মানুষের পক্ষে শান্তি ও মাঙ্গল্যের দিক থেকে তেমন উপযোগী নয়, তেমন কল্যাণপ্রদ নয়।

মানুষের মনও আজ বন্ধ্যা। তাই তিনি বন্ধ্যা ফণিমনসা, নিষ্ফলা মরুভূমি, শূন্য মরুপ্রান্তর, উপহাস্য মরুমায়া প্রভৃতি উপমান ব্যবহার করেছেন। কবি নবেন্দু চক্রবর্তী শ্রীধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানবমন' কাগজে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনন্বিত মানস বোঝাতে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন,—"সভ্যতার সঙ্কট সমাজ-ব্যবস্থা বিরোধের মধ্যে নেই, আছে মানুষের অন্তরে যে শূন্যতার মরুভূমি বহন করে নিয়ে চলেছে তারই মধ্যে। এলিয়টের কবিতায় বুর্জোয়া অবক্ষয়ের যেপ্রকাশ আমরা দেখি বন্ধ্যাভূমি ও Cactus land-এ, সুধীন্দ্রনাথে তারই প্রতিফলন দেখি মরুতে ও ফণীমনসায়। 'ক্রন্দসী'-তে 'ধূ ধূ করে মরুভূমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে', অর্কেস্ট্রা'র ফণীমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া, এবং 'উত্তর ফাল্গুনী'তে—

শতশ্রেয় মরুভূমি —সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমূমে ;
বন্ধ্যা ফণীমনসায় কণ্টকিত বিষাক্ত ধূসর।

(প্রতিবাদ)

এই মরুভূমির মধ্যে উদ্ধারের আশা অপ্রতিহার্য, শুদ্ধি ও মাঙ্গল্যের প্রতীক সে শুদ্ধজল অথবা সে বৃষ্টির পতন সভ্যতাকে স্নিগ্ধ করতে পারবে না।" সুধীন্দ্রনাথ তাই বুঝেছিলেন যে এই পৃথিবীর শুভ অস্তিবাদীরূপ দৃষ্ট হয়, তাই তাঁর কাব্যে নেতিবাদী শূন্যতার ছবিই ফুটে উঠেছে। দ্বিরুক্তি হলেও বলতে বাধা নেই যে সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন—'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।' তার আর কোনো সান্ত্বনা নেই, তার কোনো দেবদ্বিজ নেই, দেবতার অভয়বাণীও নেই—

শুষ্ক ক্ষীরোদ সাগরে মগ্ন বিষ্ণু
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু।

(কাস্তে, সংবর্ত)

'জাতক' কবিতায় এই সুর, তবে সেখানে আরও স্পষ্টভাবে কবি

বলেছেন মানুষই তার আত্মীয়কে সংহার করছে—

অপমৃত ভগবান ; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার ;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসায় প্রতুল :
অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম আত্মীয়সংহার ॥

(জাতক ১, সংবর্ত)

এইভাবে মানুষ আজ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে, তাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় একাকীত্বের বেদনা ছাড়াও নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিষণ্ণতাও রয়েছে, তার সঙ্গে আছে অবক্ষয়ের জীর্ণতা বোঝানোর জন্যে যে পরিবেশ তার বর্ণনা এবং সেই পরিবেশে মানুষের অন্তর্মানসের আর্তস্বরের প্রচ্ছন্ন গোঙানিও শোনা যায়—

নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা ; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিছুটি।
কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জানে শুধু সে-তিমিরে ; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
আমাকে আবিল করে ; একচক্ষু ছায়া,
দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা ॥ (উজ্জীবন, সংবর্ত)

এই শতাব্দীর যন্ত্রণাই তাঁকে বিচলিত করেছে—তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস এনে শান্তি খোঁজ করতে তাঁর মন চায় নি, তাঁর কাছে বিধাতা অপমৃত কিম্বা 'পিশাচ হস্তে নিহত'। বিচ্ছিন্নতাজনিত নৈরাশ্যে এবং অবলম্বনহীনতার গভীরতা থেকে তিনি লিখছেন—

আরও কিছু চাও ?
ক্লান্ত আমি ; অব্যাহতি দাও।

আলেয়ার ডাকে
দুর্লভ যৌবন মোর রুদ্ধ আজ পঙ্কের বিপাকে ;
মুছেছে আমার ভবিষ্যৎ ;
অতীতের পথ
অবলুপ্ত বিনষ্ট স্বর্গের ধ্বংসস্তূপে ;
চুপে চুপে
ছেড়ে গেছে অন্তর্যামী অরাজক অন্তর আমার :
আশা নাই, ভাষা নাই, কেবল ধিক্কার
রিক্ত মর্মে মাথা কুটে মরে ;
মৃত্যুর পাথেয়-মাত্র রাখি নাই সঞ্চয়ন ক'রে ॥

(বিস্মরণী, অর্কেস্ট্রা)

অনন্বয় কবিকে এই সমাজ সম্পর্কে নিরাশ করেছে। সামাজিক জীবনের গতানুগতিক ছকের প্রতিও তাঁর কোনো শ্রদ্ধা নেই, রুটিনগত জীবনের গতিও উন্নতি নষ্ট করে, মানুষকে বিকশিত হতে দেয় না। দিনগত পাপক্ষয়ে তাঁর বিশ্বাস নেই, সমাজজীবন থেকে তাই সরে আসার ব্যাকুলতাই মনে জাগে—

সহে না, সহে না
আর দিনগত পাপের ক্ষালনে নিত্য অনুতাপ ;
বদ্ধমুষ্টি পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায়ে সধর্মীর
সঙ্গে বিপ্রলাপ ; গোঠে বা শিকারে উদয়াস্ত বৃথা
কায়ক্লেশ ; বুভুক্ষু প্রদোষে ফেরা পৈতৃক কারায় ;
মিটাতে বংশের দাবি মধ্যরাত্রে অভ্যস্ত আশ্লেষ।
শুধু মুখ-চেনা বান্ধবের সুলভ সহানুভূতি
রোগে, শোকে, দুর্বিপাকে অনন্য সহায় ; আশ্রিতের
উৎকণ্ঠায় অনিরুদ্ধ মৃত্যুর প্রস্তুতি দুর্বিষহ
লাগে। দীপাধারে পশুর দুর্গন্ধ মেধ ; বিষায়িত
কুটীরের ভিড়ে একাকার সন্নিধির নিরালোক

জ্বালা ; বিশ্বামিত্র অর্গল কবাটে। শত শ্রেয় ঝড় ;
তাণ্ডবে উৎক্ষিপ্ত হিম দ্বারের বাহিরে ; জড়ে জীবে
দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্বতন্ত্র উভয়ে ॥

(পথ, সংবর্ত)

অনন্বয়ের এই উপলব্ধি যে কবির নৈরাশ্য-চেতনার দোসর তা বলাই বাহুল্য। আগেই কবির চারিত্র এবং নৈরাশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি, —তা থেকে কবির মানসিকতায় বিচ্ছিন্নতার বেদনা কেমন করে সঞ্চিত হয়েছে—তা বোঝার পক্ষে কিছুটা সাহায্য করবে আশা রাখি।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে আবেগ, প্রেরণা ও যুক্তিজাল

সুধীন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় কবির কোনো প্রেরণাকে আমল দিতে চান না, কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণা অপেক্ষা তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে বেশী মূল্য দিয়েছেন, এবং অন্যের ক্ষেত্রে প্রেরণার কোনো অলৌকিক আভাস সাহিত্যরচনার উপকরণ হিসেবে মানতে চান নি, বরঞ্চ অনুপ্রাণিত কবিকে তিনি কি রকম ভাবতেন—সে কথা তিনি 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থের ভূমিকাতে অকপটে ব্যক্ত করেছেন। প্রেরণাতে অলৌকিকতার আভাস আছে বলে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে প্রেরণাকে সাধ্যমতো অস্বীকার করেছেন—তার বদলে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন অভিজ্ঞতাকে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরন্তর প্রযত্নের সমীকরণ হলো সৃষ্টির মূলকথা, এই শ্রম ও প্রয়াসের পুরস্কারের ফসল হচ্ছে যে কোনো রচনা, কাব্যসৃষ্টি ত' বটেই। এই পরিশ্রমকে উপযুক্ত ভাষায় সামঞ্জস্যসাপেক্ষ করে তুলতে হবে, নচেৎ তা প্রাক্তন রীতিতে ডিঙিয়ে নতুন চালে চলতে পারবে না, এবং গতানুগতিকতার ঘানি টানাই তার ভাগ্যক্রম হয়ে দাঁড়াবে। সুধীন্দ্রনাথ ভাবতেন—'যাঁরা ভাবতে অভ্যস্ত যে কাব্য প্রেরণা বা অভিজ্ঞতার লীলাভূমি তাঁদের বিচারে কলাকৌশল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মশত্রু।'

তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতিকে মর্যাদা দিতে গেলে মনে হবে তিনি কাব্যে আবেগকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, বরং আবেগপ্রাধান্য আধুনিক কাব্যের এক পরিপন্থী ব্যাপার বলেই ভাবতেন। আবেগ নিয়ে তিনি বেশী মাতামাতি করেন নি, প্রেরণা নামক দৈবী শক্তিকেও কখনো আমল দেন নি। কিন্তু তাঁর কাব্যে আবেগ নেই—এমন কথা আমি বলি না।

রোমান্টিকতার মিশ্রণ যে কাব্যে থাকে—তাতে আবেগ থাকেই, এবং যাঁরা কবিত্বের সহজাত সৃষ্টিক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন, তাঁরাও আবেগ-প্রবণ বলে আমরা জানি। সুধীন্দ্রনাথ তথাকথিত স্বভাবকবি বা সহজাত সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী কবিশ্রেণীকে স্বীকার করতে চান নি। এই স্বভাবকবি বা সহজ সৃষ্টির অধিকারী কবির আবেগকেই অন্তরের কাব্যপ্রেরণা বলা হয়। সুধীন্দ্রনাথ তার এই আবেগকে বা প্রেরণাকে স্বীকার করেন নি. তিনি কবির অন্তরে কোনো লোকোত্তর আবেগ বা অলৌকিক প্রেরণা কাজ করে—এ তত্ত্ব ভাবতে ভাল-বাসতেন না, পক্ষান্তরে যথার্থ কবির 'অলৌকিক প্রেরণাকে' তিনি অস্বীকার করে গেছেন। তিনি লিখছেন—"এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একদা আমার কলমও চলত অবাধে ; এবং বোধহয় সেইজন্যেই, প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে সাহিত্যসৃষ্টির উক্ত উপ-করণ আমি সাধ্য পক্ষে মানতে চাইনি, তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে। অবশ্য বর্তমানে, লেখনীর পক্ষাঘাত সত্ত্বেও, স্বপ্নচারী পথিককে যেমন, অনুপ্রাণিত কবিকে আমি তেমনি ডরাই ; এবং কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মূল্য বাড়ছে বই কমছে না।

আবেগরাহিত্যকে সুধীন্দ্রনাথ যতই আধুনিকতা বলুন, তিনি অনায়াসেই 'যযাতি' লেখেন, এখানে গদ্যধর্মী কাব্যত্ব এবং আবেগ ওতপ্রোভাবে জড়িয়ে থাকে, কাব্যের যদি সংক্ষিপ্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত কনোটেশনের উল্লেখ করতে হয়—তবে আবেগসর্বস্বতাকে না মেনে পার পাওয়া যাবে না ; সুতরাং সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আবেগবর্জিত—এরকম বিশেষণ ব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁর আবেগকে চেপে রাখতে চেয়েছেন, কুসুমকোমল পেলবতায় রোমান্টিক দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে তাকে ভাস্বর করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন, ক্রিয়াপদকে আগিয়ে পিছিয়ে দিয়ে, সহজ শব্দের দুরূহ তথা অপ্রচলিত (দু একটি ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতম কিম্বা অর্থহীন শব্দ) প্রতিশব্দ বসিয়ে কাব্যের আবেগ পাঠকের অনু-

ভবলোকের আড়ালে আনার চেষ্টা করেছেন মাত্র, একেবারে আবেগ-বর্জিত হননি। অস্তিত্ব না বলে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন—'অস্মিতা' তুর্লভের বদলে ব্যবহার করলেন 'তুরাপ,' বিনিময়ের স্থলে লিখলেন 'পরাবর্ত' ; তুঃখকর প্রচলিত শব্দ কিন্তু তিনি তার বদলে বসালেন 'অরুন্তুদ,' অক্ষয় বলতে গিয়ে বললেন—'অনশ্বর'। এর দ্বারা তাঁর তুরূহতা নিয়ে কথা উঠতে পারে, শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এবং মেজাজের বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু আবেগহীনতা কি করে প্রমাণিত হবে ? প্রেরণাবাদী কবির মতো আবেগসর্বস্বতাকে তিনি প্রাধান্য দেন নি, তিনি নিজের যুক্তি এবং বুদ্ধির ওপর বেশী আস্থাশীল ছিলেন, কিন্তু শুধু যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির মালারচনাই কাব্য নয়, আবেগের সহজলীলার ছোঁয়া না থাকলে কবিতার আমেজ আসতে পারে না—এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও তাঁর কাব্যে আবেগের অভাব ঘটে নি। এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে লেখার কথা যদি কখনও মনে এসে জমে তবে তার প্রকাশের ব্যবস্থা মনই করে দেবে—'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থের ভূমিকাতেও সেই স্বীকৃতি আছে, এমনকি, কবির মনে লোকোত্তর একটা পটভূমির কথাও 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে মেনে নিয়েছেন। কবির মধ্যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, এবং আবেগের জায়গায় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তু একটি উদাহরণ দিই আমার বক্তব্যের সমর্থনে—

> বিদায়ের লগ্নে আজ নিঃসংকোচে কব,
> "হে মোর ক্ষণিকা,
> তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।
> আগন্তুক শ্রাবণের বৈত্যুতিক উল্লাসের মতো,
> তীব্র প্রবর্তনা তব সাঙ্গ হোক সাশ্রু অন্ধকারে ;
> অবেদ্য বিস্ময় তারে
> ক'রে দিক অনির্বচনীয়॥"

ইচ্ছা হলে আমারে ভুলিও,
ইচ্ছা হলে দিও
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় তব মুহূর্তের নিষ্ক্রিয় মমতা।
আর যদি পারো, তবে মনে রেখো এইটুকু কথা—
অপণ্য দ্রব্যের ভারে যবে মোর তরী
নিঃস্রোত জীবনপঙ্কে হয়েছিল নিতান্ত নিশ্চল,
তুমি কৃপা করি,
এনেছিলে আজন্মের সকল সম্বল
সে-জঞ্জাল কিনে নিয়ে যেতে ;
নিষ্কাম সংকেতে
তুমিই দেখায়েছিলে নিরুদ্দেশে আশ্রয়ের তীর
শান্তিসুনিবিড় ॥ (মূর্তিপূজা, অর্কেস্ট্রা)

এখানে আবেগপ্রবণতা কি কাব্য-নির্মিতির উপকরণের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে নেই ?

সুধীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে পারেন এই বলে যে আবেগ, ঐশী প্রেরণা প্রভৃতি অনুভব থেকে কবিতা স্বয়ম্ভু হয়ে জন্মায় না, তিনি আমাদের যতই বুঝিয়ে বলুন যে কঠোর পরিশ্রম ও শব্দ নিয়ে ঐকান্তিক সাধনার ফসল হলো কবিতা। সমালোচকেরা বা কবির নিকট বন্ধুরা তাঁর মুখের ওপর হয়তো সৌজন্যবশত এসব কথার প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু এই কবি যখন লেখেন—

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে.—
আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিতবসন উরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার ;
নব দূর্বার চিকন পুলক ও-বরদেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে ॥

মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে ;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু ;
সন্নিধি তব সৃজন-আকুতি পরাণে ভনে ।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ॥

(অর্কেস্ট্রা, ৭ নম্বর)

তখন তাঁর অনুরাগের উষ্ণতালালিত স্নেহ কিভাবে এই কবিতায় বিগলিত হয়েছে— তা কি আমরা দেখতে পাই না ? কবি কি তাঁর এই অনুভববেদ্য উপলব্ধিখানি শব্দাশ্রয়ী করার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন বহুকাল—না, শব্দচয়নের জহুরীপনায় তাঁকে অধৈর্য হয়ে ভাবতে হয়েছে, একি কবির স্বানুভব-উৎসারিত উচ্ছ্বসিত বাণী নয় ? এখানে কি তাঁর আবেগ লুকোবার কোনো উপায় আছে ? যে কোনো পাঠকই কবির উষ্ণ আবেগের পরিচয় পাবেন, এবং এই পরিচয় পেয়ে কবিকে ধন্যবাদই জানাবেন ।

উদাহরণের বাহুল্য ঘটালে পাঠকের যদি মার্জনা মেলে—তবে আর একটি সুদীর্ঘ কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিতে পারি ।—

আমার প্রেমের অর্ঘ্যপ্রদানে
অপারগ সেও, জানি ;
আমিও বুঝি না সে-মূক নয়ানে
লিখিত কী গূঢ় বাণী ।
বাহিরে তাকায়ে সে যে দেখে শুধু
চারিপাশে মোর মরু ক'রে ধু-ধু ;
আমি অবলোকি তার করপুটে
দলহীন মালাখানি ।
বকুলফোটানো সে-চরণে লুটে
ধুলাই মাখিব, জানি ॥

পথে পথে ঘুরে ছেঁড়া থলি পুরে
যা-কিছু করেছি জমা,
তুমিই, উদার, দাম দিবে তার,
করিবে দীনতা ক্ষমা।
তাই আজি তব শুভ সমাগমে
পলাতক গান ফিরে আসে শমে :
তাই মনে হয় মঙ্গলময়
নিরুদ্দেশের অমা।
চরণে শরণ মাগি, হে মরণ ;
নাও, যা করেছি জমা॥

বন্ধু, এবার বোলো না, বোলো না,
ঠাঁই নেই ভরা নায়ে'।
দোলাও ঢেউয়ের দোদুল দোলনা
আমার অচল পায়ে।
নির্বাক পালে ঝড় ভরে দাও।
মাথার উপরে বজ্রে জাগাও।
মুষলধারায় কুশল ঝাপটে
ধুলা ধুয়ে দাও গায়ে।
পরিবৃত করি মহাসংকটে
তুলে নাও, সখা, নায়ে॥

(মরণ তরণী, উত্তর ফাল্গুনী)

এই কবিতা পড়ার পর পাঠক কি করে বলবেন যে এর স্রষ্টা অন্তরের ঐশী প্রেরণার তাড়না অনুভব করেন নি বা স্বভাব-কবির আবেগের দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত নন। আবেগের সহজলীলার স্বচ্ছন্দ বিচরণ ঘটেছে 'মরণ তরণী'র গোটা দেহেই, এখানে সুধীন্দ্রনাথের মনোভাব-সতর্কতার পরিচয় কম, আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির কারুকার্য এখানে তেমন প্রকট

নয়। এই রকম আরো অনেক কবিতাতেই তাঁর আবেগের মাতামাতি লক্ষিত হবে— যদিও কাব্যের কায়াগঠনে তিনি সুঠাম ভাস্কর্যের বিন্যাস স্থাপিত করেছেন।

তবে আবেগরাহিত্য প্রসঙ্গে একথা ঠিক যে সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতে যুক্তি যতটা আধিপত্য করেছে, আবেগ ততখানি প্রাধান্য পায় নি, তিনি কবিতাকে ঘন সংহত রূপদান করতে শব্দ-পৃথুল করতেন, এজন্যে তিনি যথেচ্ছ ও যথেষ্ট শ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যয় করতেন; আবেগ-বহুল বাগ্‌বিস্তার পরিহার করার জন্যে তাঁকে কবিতার সংস্কার ও পরিমার্জনা করতে হতো; কলাকৌশলকে তিনি 'স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মশত্রু' বলে ভাবতে পারতেন না, তাই তাঁর অনেক কবিতাকে খানিকটা নিরুত্তেজ বলে মনে হয়, এবং সেইজন্যেই তাঁকে আবেগরহিত কবি বলে অভিহিত করা হয়।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে আবেগ অপেক্ষা চিন্তার প্রাধান্য, বিশ্বাসের চেয়ে নৈরাশ্যের কথাই বেশী ধ্বনিত। এরও কারণ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের দিগন্তবিস্তারী প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে যে ক'জন তদা-তরুণ বাঙালী কবি নতুন মত ও পথের অনুসন্ধানে ব্যতি-ব্যস্ত ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চোখের ওপর এই কবিকুল দেখেছিলেন যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু কবি রবীন্দ্রনাথের আকাশেই তাঁকে কেন্দ্র করে উপগ্রহের মতো আবর্তিত হয়েছেন, রবীন্দ্রানুসারী হওয়ার মধ্যেই তাঁরা আনন্দলাভ করেছেন। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম আর অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে হাঁটতে নারাজ হলেন। সুধীন্দ্রনাথের মনে হলো তিনি 'বিংশ শতাব্দীর সমান-বয়সী', তিনি 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে' মানুষ হয়েছেন, তিনি লিখলেন—

নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে;

ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথ সমর :
মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর,
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে ;
তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লানি পরাজয় ঢেকে ;
প্রতিলোম অভিযানে লোকযাত্রা হবে অগ্রসর,
আমাকে হৃৎপদ্মে ধরে ; ব্যর্থ বীর্যে যীশুর দোসর,
আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে ॥

এখানে আবেগ নেই, কবির কাছে স্বয়ম্ভু প্রেরণার কোনো হাতছানি নেই—এই জাতীয় কবিতা দেখেই তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি সুচিন্তিতভাবেই আবেগকে তাঁর কাব্যে প্রশ্রয় দেন নি।

তিনি যে শব্দাশ্রয়ী কবি, শব্দের ভেলায় চেপে রসের দুস্তর দরিয়ায় পাড়ি জমাতে চেয়েছেন—এ প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করেছি, পরে তাঁর কাব্যে যুক্তিপরম্পরার শৃঙ্খল কেমন ভাবে এসেছে তাও দেখাচ্ছি। আবেগকে দমন করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যুক্তিকে আঁকড়ে ধরেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্য গদ্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে। নৈয়ায়িক দার্শনিক যেমন করে তাঁর বক্তব্য হাজির করেন, সুধীন্দ্রনাথ সেই পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। কবির মনোলোকে অনুভূতিময় একটা রহস্যের আবছা অস্পষ্টতা থাকে—যা কখনো কল্পনায় রঙীন, হতাশায় ধূসর, কখনো বা দীপ্তি ও দ্যুতিতে ভাস্বর। সুধীন্দ্রনাথ কবি-মনের এই রহস্য-ময়তাকে প্রশ্রয় দেন নি, ফলে তাঁকে প্রতর্কনিষ্ঠ কবি বলে সহজেই চেনা যায়। তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অন্তর্মানসের ঐশী প্রেরণাকে অনিবার্য বলে না মেনে কাব্য থেকে উচ্ছ্বাসকে ছেঁটেছেন, গদ্যধর্মিতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপ্রচল শব্দের সন্ধানে কঠোর শ্রমশীল হয়েছেন। কল্পনার দাসত্ব স্বীকার করে অতি তরল ভাষার উচ্ছল কলকল্লোলকে তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না, তাই তিনি তাঁর কাব্যকে আবেগ-রহিত করে গদ্যের ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, আবেগকে মুছে দিতে গিয়ে তাঁকে শ্রমসাধ্য অনুশীলনও করতে হয়েছে।—এর ফলে কাব্যের

কায়াগঠনে এমন কতকগুলি পদ ব্যবহৃত হয়েছে—যেগুলি কবিতায় সচরাচর বসে না। যুক্তি বা ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থরচনায় যেমন অনুপপত্তির আলোচনায় অন্তত, বস্তুত, অর্থাৎ, তথাচ, অথবা, ফলত, তবুও, যদিচ তাই, নতুবা প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহার করা হয়, তেমনি এবম্বিধ অব্যয়গুলি সুধীন্দ্রনাথ হামেসাই তাঁর কাব্যে প্রয়োগ করেছেন, এবং প্রেরণাবাদী কবিদের অতিশিথিল অতিতরল কোমলতামাখা ভাষা গজভুক্ত কপিত্থবৎ পরিত্যাগ করেছেন। কাব্যের বক্তব্যকে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ উপস্থাপনার পদ্ধতির পথে চালনা করতে নির্দ্বিধ ছিলেন। কয়েকটি টুকরো টুকরো উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) বহুকষ্টে শিখেছি সাঁতার :
অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর।

(জেসন, সংবর্ত)

(২) বস্তুত জোয়ারে
ততটাই ফিরে আসি। (তদেব)

(৩) নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে।

(যযাতি, সংবর্ত)

(৪) প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ ;
অহৈতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চনার লাজ
আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন॥
তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে,
কায়-মনে তোমারেই চাই।

(দুঃসময়, উত্তর ফাল্গুনী)

(৫)   এতদিনে সফল নতুবা
সে-বাচাল যুবা।   (সংবর্ত, ঐ নামের গ্রন্থ)

(৬) আমি অব্যাহত নদ, পিপাসার্ত পশুদের ক্ষুরে
যদিচ আবিল, তবু চরিতার্থ আমার প্রবাহ।
(জাদুঘর, ক্রন্দসী)

(৭) ফলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আজ আমি
(জেসন, সংবর্ত)

(৮) ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সেদিন—
অঘ্রানের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক।
(শর্বরী, উত্তর ফাল্গুনী)

অঙ্কশাস্ত্রের উপপাদ্য প্রমাণ পদ্ধতির মতো এক একটি প্রশ্ন করে (তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনায় যার উত্তর পেতে পাঠকের একটু দেরী বা অসুবিধা হয় না) কবি তাঁর প্রামাণ্য বক্তব্যে উপনীত হয়েছেন। 'ক্রন্দসী' গ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। আর একটা ছোট কবিতার কথা মনে পড়লো—যেখানে অথবা, ফলত, যদিচ, অর্থাৎ, কারণ, সুতরাং—সমস্ত পদেরই সাক্ষাৎ মিলবে এবং পাঠকের বুঝতে একটুও কষ্ট হবে না যে কেমন করে যুক্তির পথে কবি তাঁর উপলব্ধিমালা উপস্থিত করে থাকেন। কবিতাটির নাম 'জাতক (২)' এবং এটি আছে 'সংবর্ত' গ্রন্থে। কবিতাটি নিচে তুলে দিলাম—

অথবা পিশাচ সুদ্ধ গৃধ্নু ইতিহাসের খাতক ;
এবং সে-ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্প স্বরূপ।
ফলত যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ,
তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন পাতক॥

অর্থাৎ কৈবল্য স্বপ্ন : জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্যবাধক ;
অনুবন্ধী শাস্তি-শান্তি ; একান্তর উল্কা ও খধূপ ;
নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্গের মধুপ :

সু. ৩

পুণ্যাত্মারা পরকীয় দায়িত্বের সংক্রান্তিসাধক ॥

কারণ বিচারক্ষম নয় অন্ধ, অনাথ নিয়তি ;
তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক :
প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত পুরস্কৃত গচ্ছিত ভূষণে ॥

সুতরাং নির্দ্বন্দ্বও নির্বন্ধের বিপরীত রতি :
বরঞ্চ দ্বৈরথ ভালো, গুপ্ত হত্যা শুধু সাংঘাতিক :
আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে ॥

তর্কের মতো প্রতিপাদ্য প্রমাণ প্রকরণের সজ্জার প্রতি তিনি নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন ; 'তাই' শব্দটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একেবারে আটপৌরে শব্দ, কবি এই শব্দকেও যুক্তির হাতিয়ার হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন, যেমন—

সে জানিত সময়েরে শুধু গতি পারে পরাজিতে,
তাই তার মুগ্ধ দৃষ্টি হয়েছিল আবেগে উতল ।

(বিলয়, উত্তর ফাল্গুনী)

সুধীন্দ্রনাথ মালার্মে ও মধুসূদন

'সংবর্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ বেশ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শকেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। ["মালার্মে-প্রবর্তিত-কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ, এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।"—'সংবর্তে'-র ভূমিকা।]

মালার্মে শব্দকে তার প্রচলিত অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী কোনো প্রতীকতা আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথও শব্দ-ব্যবহারের সেই সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি দু'ভাবে এই ব্রত সাধন করেছেন। এক, প্রচলিত অর্থের শৃঙ্খল থেকে শব্দকে খুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা; দুই, বহু ব্যবহারে জীর্ণ শব্দকে ছিন্ন কন্থার মতো ত্যাগ করে সেখানে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মতোই বিশ্বাস করতেন কবিতার অর্থকে যে শব্দকেন্দ্রিক হতেই হবে—এমন নয়; বিজ্ঞানের বিষয় বুঝতে গেলে যেমন ঠিক-শব্দের ঠিক অর্থ জানতেই হবে, কাব্যে তেমন করা চলে না, তাই শব্দের ব্যঞ্জনাধর্মী চরিত্রের প্রতি তাঁর টান বেশী হয়েছিল, অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের অপ্রধান কারণ হিসেবে এই ব্যাপারকেও উল্লেখ করা যায়। প্রথম বা প্রধান কারণের কথা আমি আগেই বলেছি—কবির নিজের উক্তির উল্লেখ করে।

গোড়ায় মালার্মেকে দুর্বোধ্য কবি হিসেবে চিহ্নিত করে ফরাসী সমালোচকেরা তাঁর ভাষা সম্পর্কে এমন কথাও বলেছেন যে তিনি বুঝি বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন এবং তাঁর কাব্য দেশী ভাষায় অনূদিত হলে তা দেশের লোকের বোঝার পক্ষে বিশেষ সুবিধের হয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশের পাঠকের বোঝার সুবিধের দিকে চান নি,

তিনি তাঁর মানসবৃত্তিকেই মর্যাদা দিয়ে—'কবিতা বোঝবার জন্ম যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশী বাজবার জন্মে'—মতকে স্বীকার করে নিয়েই মালার্মের পন্থা অনুসরণ করেছেন ; তাই তাঁর দুর্বোধ্য হতে কোনো-রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখা যায় নি। তাঁর এই সিদ্ধান্তে তিনি অটল থেকেছেন ; বিরূপ সমালোচনা বা পরোক্ষ নিন্দা—কিছুই তিনি গায়ে মাখেন নি। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী' যে কবি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারেন—তিনি স্বীয় আচরণে তার প্রমাণ রেখেছেন বলতে হবে।

রোমান্টিক কবিরা দূরের প্রতি মোহাবিষ্ট তন্ময়তার আবেশে অধীর হন, এবং সেই অধীরতার প্রকাশ ফতকটা সহজ এবং অকপট হয়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সহজ কথায় আবেগ প্রকাশের রীতিকে প্রথানুগ ভাবতেন, তাই শব্দ ব্যবহারে মালার্মের মতো তিনি শব্দ-সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দিতে চাইতেন, কিন্তু কোন্ শব্দের মাধ্যমে কোন্ প্রতীকতার বা তাৎপর্যের অনুপ্রবেশ—তার কোনো স্থির ব্যাকরণ নেই, ফলে কবি কোন্ শব্দে কোন্ ব্যঞ্জনার আরোপ করেছেন—তা অনেক সময় বোঝা যায় না, এই কারণে সুধীন্দ্রনাথকে নিয়েও বিরুদ্ধ-বাদীরা হাস্যরসের সৃষ্টিকল্পে রসিকতা করতে ছাড়েন না এই বলে যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতাও সরল বাংলায় অনুবাদযোগ্য !

নীল রঙের উল্লেখ করে প্রতীকবাদী কবি কি ব্যক্ত করতে চান—তা চট করে বোঝা কঠিন ; প্রতীকবাদীরা কখনই অর্থকে প্রাধান্যদানের কথা ভাবেন না, ধ্বনিময়তাকেই তাঁরা কাব্যের প্রাণ বলেই ধরে নেন, কিন্তু কবিতাটির সামগ্রিক ব্যঞ্জনা অথবা তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে যদি কোনো পাঠক প্রতীকের ঘেরাটোপ উন্মোচন করে তাৎপর্যের স্বরূপ সন্ধান করতে প্রয়াসী হন, তবে সেই পাঠককে একেবারে অন্ত্যজ বা অকুলীন তথা কবির প্রতি অকৃতজ্ঞ ভাবা ঠিক হবে না ; সেই পাঠক নীলরঙের স্থানে কবির চৈতন্যলোকের মেদুর স্পর্শজাত হয়ে কোন্ অর্থের উদ্ভাস আছে ধরবেন ? নীলরঙ সাধারণত আভিজাত্যকে

দ্যোতিত করে, এবং আভিজাত্যের প্রতীকতায় নীল বর্ণের ব্যবহার এমন বহুলপ্রচার যে না কবির পক্ষে না পাঠকের পক্ষে সৃষ্টি বা উপলব্ধির কোনো গৌরবার্জনের সুযোগ থাকে। কিন্তু নীলরঙের মধ্যে স্বর্গের ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়, কিন্তু আভিজাত্যের বদলে যদি আদর্শবাদিতার তাৎপর্য ফোটানো হয় তখনই তা পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মালার্মে আবার নীলরঙের মাধ্যমে চিরন্তন সৌন্দর্যকেও বোঝাতে চেয়েছেন।

এই রকম সাদা রঙের উল্লেখেও পবিত্রতার ইঙ্গিত বোঝা যাবে, মৃত্যুকেও শ্বেত বর্ণাশ্রয়ী হতে দেখা গেছে, এমনকি শৈত্য বা তুষার—চেতনাকে সাদার আভাসে প্রতীকবাদীরা ব্যক্ত করেন। লালরঙের মাধ্যমেও কখনো শক্তি, সাহস, আগুন, উগ্রতা, শ্রমিকের অধিকার, কখনো বা উজ্জীবনের ব্যগ্রতা সূচিত হয়েছে। এর ফলে প্রতীক কবিতার অর্থোপলব্ধি খুবই কষ্টকর। আবার বলি প্রতীকবাদীরা শব্দার্থকে গৌণ মনে করেছেন, শব্দের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথকে বলা হয়—তিনি শব্দধ্বনির সন্ধানী প্রয়াসশীল মানস। তিনি তাঁর কাব্যে যে সব চিত্র উপস্থাপনার জন্যে শব্দ সাজিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে তাঁর মননে এক বিশেষ তাৎপর্য আরোপের প্রয়াসই লক্ষিত হয়েছে। নৌকার ছবি কিম্বা মরুভূমির চিত্রে বিবিধ ব্যঞ্জনা তিনি আরোপ করেছেন, অন্যত্র এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি। শব্দের অর্থকে ডিঙিয়ে স্ফোটধ্বনির এই আরোপণেই সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের সগোত্র।

শুধু শব্দ-সাধনার প্রকরণে নয়, কাব্যের অন্তর্মহিমায়ও দু এক জায়গায় সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালার্মের মিল আছে, এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা দীপ্তি ত্রিপাঠী দু একটি উদাহরণসহ কিছু আলোচনা করেছেন। "মালার্মের বিষণ্ণ, নেতিবাদী জীবনদর্শনও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকে প্রভাবিত করেছে। মালার্মের কবিতায় যেমন বারংবার গোরস্থান, কবর, মৃত্যু, ভাঙা

জাহাজ, অবসাদ, নিখিল নাস্তি, কথাগুলির প্রয়োগ দেখা যায় এবং morbidity বা বিষাদ তিক্ততা বহন করে, সুধীন্দ্রনাথেও তেমনি দেখা যায় 'মরুভূমি', 'নরক', 'শব', 'প্রাবরণী' (shroud), 'পিশাচ', 'শটিত' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ। মালার্মে যেমন ennui কথাটির একাধিকবার প্রয়োগে জীবন সম্বন্ধে অবসাদ, ক্লান্তিআত্মগ্লানি ও বিরক্তির ভাব একসঙ্গে দ্যোতিত করেছেন, কিংবা 'meant' কথাটির মধ্যে দিয়েছেন নাস্তির ইঙ্গিত, সুধীন্দ্রনাথও তেমনি 'নির্বেদ', 'বিবিক্তি'—এই শব্দগুলির মধ্যে ঐ একই মনোভাব ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। নেতিবাদী জীবনদর্শনের প্রতীকরূপে 'ভগ্নতরী' বা 'মগ্নতরী' চিত্রকল্প উভয় কবিই ব্যবহার করেছেন।"

রচনার সংখ্যার দিক থেকে মালার্মে স্বল্পসংখ্যক কবিতা লিখে গেছেন, তাঁর অনূদিত কবিতার সঙ্কলনে মাত্র চৌষট্টিটি কবিতার সাক্ষাৎ মেলে, এবং ফরাসী ভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কাছ থেকেও শোনা যায় মালার্মে রচিত কবিতার সংখ্যা অনুরূপ। কবি সুধীন্দ্রনাথের রচনাকালের দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাঁর ফসলও খুব বেশী নয়। মালার্মে কবিতার শব্দ-স্বরূপ নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, সুধীন্দ্রনাথেরও শব্দসুন্দরী সম্পর্কে চতুর্দশপদী কবিতা রয়েছে—যার উল্লেখ এবং অংশবিশেষের উদ্ধৃতি আগেই গোচরীভূত করা হয়েছে। কাব্যের মধ্যে মালার্মে কোনো স্থির প্রত্যয়কে আত্মস্থ করে কোনো দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে উপস্থিত হতে পারেন নি, সুধীন্দ্রনাথেও তেমন চেষ্টা নেই। সুধীন্দ্রনাথ কখনো রোমান্টিক কখনো ক্ষণবাদী, শূন্যতাদর্শনে বিশ্বাসী, কখনো বা ধ্রুপদীরীতির স্থপতি। জীবনের একটা সুস্থির প্রত্যয়কে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ হয়তো করেছিলেন, কিন্তু প্রচার করার দিকে তেমন মনোনিবেশ করেন নি, সেদিক থেকেও তিনি মালার্মের সগোত্র।

'সংবর্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন বলেই মালার্মের সঙ্গে তাঁর কাব্যমেজাজ এবং শিল্পকলার মিলের এত কথা বলতে হলো, কিন্তু মালার্মের সঙ্গে তাঁর গরমিলও

আছে কয়েকটি বিষয়ে। কাব্যের ফর্ম অর্থাৎ রূপ-প্রকরণ বা ছলাকলার দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের অনুসারী হলেও কবির ব্যক্তিসত্তাকে সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু কাব্যের রূপপ্রকরণের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেন নি— যা মালার্মে করেছিলেন, মালার্মে নিজসত্তাকে কাব্যের মধ্যে প্রকট করেন নি, কবিতার অন্তরালেই তিনি সুস্থিত হয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু সবসময়ই কাব্যে রূপের সাধনায় সচেষ্ট থাকলেও নিজেকে একেবারে উদাসীন করে কাব্যে নৈর্ব্যক্তিকতা আনেন নি। ফলে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যক্তি সুধীন্দ্রনাথের একটি অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, অর্থাৎ কবিসত্তা— সেখানে নির্বাসিত নয়, যা মালার্মের কাব্যে দেখা যায়, কবি আত্মস্বরকে একেবারে স্তব্ধ করেছেন।

যে কারণে মালার্মে সুধীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট, সেই কারণের জন্যেই কিন্তু মালার্মের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পার্থক্য রচিত হয়েছে। কথাটা প্যারাডক্সের মতো শোনাচ্ছে জেনেও বলতে দ্বিধা নেই যে, মালার্মে এমনভাবে শব্দ ব্যবহার করতেন যার দ্বারা তাঁর আবেগ অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় আভাসিত হতো ; অভিধাশক্তির ওপর তিনি নির্ভরশীল ছিলেন না, সব সময়েই তিনি ব্যঙ্গার্থকেই প্রাধান্য দিতেন। আর সুধীন্দ্রনাথ শব্দ সম্পর্কে প্রচণ্ড রকম সচেতন থেকেও কাব্যে ততটা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি না করে নতুন তথা অপ্রচলিত শব্দের প্রতি মোহ দেখিয়েছেন খুব বেশী রকম, ফলে কাব্যের স্বাদুতা গেছে কমে, ইঙ্গিতময়তাও নষ্ট হয়েছে। 'বন্দ্রঅলি' বললে না কোনো ব্যঞ্জনা জাগে, না এর বাচ্যার্থ কাব্যত্বে উন্নীত হয়। শব্দের পরিচিত অর্থ সম্পর্কে পাঠকের যতটা আগ্রহ থাকে, পরিচিত সেই অর্থের খেই ধরে সংশ্লিষ্ট অর্থকে অবলম্বন করে কোনো তাৎপর্য লোকের অনুসন্ধানের শ্রম পাঠক চট করে স্বীকার করতে চায় না।

এছাড়া আরো তফাৎ আছে। ন্যায়দর্শন শাস্ত্রে যেমন যুক্তি পরম্পরা —সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই প্রকরণের বাহুল্য দেখা যাবে। কিন্তু মালার্মে ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর পাঠকের কাছে উপস্থিত হতে চেয়েছেন,

তিনি সর্বথা যুক্তির পথ পরিহার করেছেন। পক্ষান্তরে সুধীন্দ্রনাথ যে যুক্তিপদ্ধতিকে কাব্যের প্রযুক্তি করেছেন কেমন ভাবে—সে সম্পর্কে আমি তার কাব্য থেকে একাধিক উদাহরণ তুলে তাঁর কাব্যপ্রকরণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

মালার্মে বাস্তববিমুখ ছিলেন না, কিন্তু বাস্তবকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে রেখে কোনো চিত্র আঁকতেন না, সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সজ্ঞান দিলেন, বাস্তবকে তিনি বিমূর্ত একটা অনুভবের জগতে গ্রথিত করতে পারেন নি, মালার্মের সঙ্গে তাঁর এই পার্থক্যটাও লক্ষ্য করার জিনিস। তাই মালার্মে যেখানে মূলতঃ প্রতীকী কবি হয়ে চিহ্নিত হলেন, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি কবিতায় প্রতীকধর্মের আরোপ ঘটাতে প্রয়াসী হলেন বটে, কিন্তু প্রতীকী কবির পূর্ণ প্রকৃতি তিনি লাভ করলেন না। তাছাড়া তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত যে 'উটপাখী' কবিতা যা প্রতীকী কবিতা বলে স্বীকৃত, সেখানকার প্রতীকত্ব বিচারেও নানারকম ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা হয়। 'সংবর্তের' ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথের ঐ সামান্য একটি কথাতে আমরা যেন সত্যিই ভেবে না বসি যে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মেরই অনুসারী কবি। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ১৩৬৭ সালের 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন-পৌষ সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি লেখায় বলেছেন—"তাঁর কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়,—তা নয় বলে আমি অন্তত খেদ করি না; তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সঙ্কল্প, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়।"

কেউ কেউ আবার সুধীন্দ্রনাথকে মধুসূদনের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। উভয় কবিই দত্তকুলোদ্ভব, এবং দুরূহ তৎসম শব্দ ব্যবহারে উভয়েরই প্রীতির পরিচয় রয়েছে। মধুসূদনের ঝোঁক-বিন্যাসকে গাম্ভীর্য দান করা, এবং ক্লাসিক্যাল চেতনায় মধুসূদন যেমন বাংলা সাহিত্যে প্রথম পথ-

প্রদর্শক, তেমনি সুধীন্দ্রনাথও ক্লাসিক রীতিতে আশ্রিত। উভয় কবিই আত্মতাড়িত। মধুসূদন সর্বপ্রথম মহাকাব্য রচনায় এই ক্লাসিক্যাল রীতি ব্যবহার করেছেন, ফলে তাঁকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হয়েছে, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ লিরিক কাব্যের ব্যাপারী, তাঁকে আবেগাশ্রয়ী হতে হয়েছে, এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের দিগন্তবিস্তৃত ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত, তাঁকে সতর্ক হয়ে রবীন্দ্র প্রভাব এড়াবার জন্যে সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথকে তাই ইঙ্গিতে আভাসে ব্যঞ্জনায় প্রতীক প্রয়োগে সতর্ক হতে হয়েছে, আর মধুসূদনকে বস্তুর দিকে, বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়েছে বেশী। ফলে সুধীন্দ্রনাথে আবেগের প্রাধান্য ঘটেছে আর মধুসূদনে ইন্দ্রিয়-চেতনার বাড়াবাড়ি দেখা গেছে। মধুসূদন মহাকাব্যের রচয়িতা আর সুধীন্দ্রনাথ গীতিকবি, অথচ কাব্যের কায়াগঠনে উভয়েই ক্লাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। মহাকাব্যকারের সঙ্গে গীতিকবির মিল ক্বচিৎ থাকতে পারে। মহাকাব্যে টুকরো টুকরো ব্যঞ্জনা আরোপের সুযোগ কম, কিন্তু গীতিকবির ব্যঞ্জনাই তাঁর প্রধান হাতিয়ার।

আর এক দিক থেকেও মধুসূদনের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তফাৎ আছে। মধুসূদনের তীব্রতা সুধীন্দ্রনাথের ছিল না। মধুসূদন ঐরাবতিক উচ্ছ্বাসে হৈ হৈ করে চলেছেন, একসঙ্গে একাধিক পণ্ডিতদের শ্রুতিলিখন দিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ সৃষ্টির অবিশ্বাস্য কাহিনীর চমক ছেড়ে দিলেও রচনায় যে তিনি বেগবান ছিলেন— এ সত্য অস্বীকার করবার নয়। কিন্তু সুধীন্দ্র-নাথ ছিলেন ধীর স্থির, শব্দব্যবহারে ভীষণ খুঁতখুঁতে ; মনের মতো পরিচ্ছন্ন তথা অভীষ্ট উপযুক্ত শব্দানুসন্ধান পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারতেন। এবং যতক্ষণ না অভীপ্সিত শব্দ খুঁজে পাওয়া যেত, ততক্ষণ কিছুতেই তিনি শান্ত হতে পারতেন না! আর শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধুসূদনের অনবধানের নজির খুব কম নেই।

মধুসূদনকে ওপর ওপর হয়তো আশাবাদী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেই নৈরাশ্যের একটি সকরুণ বেদনা লালিত হয়েছিল, তাঁর মন আশার ছলনায় পীড়িত হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যেও নৈরাশ্যের হাহাকার।

একরূপতা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি কবির টান

কয়েকটি শব্দের প্রতি, একই চিত্ররচনার প্রতি, পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো, একই ধরনের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ এক ধরনের মনস্কতা ছিল—যাকে তাঁর অভ্যাস না বলে মমতা দেখানোর প্রশ্রয় বলে বর্ণনা করা চলে। মরুভূমির ছবি, নৌচালনার ব্যাপার, অন্ধকারের বর্ণনা, কিংবা ভারতীয় ইতিহাস পুরাণের কোনো প্রসঙ্গের আভাস—তাঁর কাব্যে বার বার আবৃত্ত হয়েছে। এগুলি কোনো পাঠকেরই চোখ এড়িয়ে যাবে না।

সুধীন্দ্রনাথ শূন্যতার কবি। তিনি নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন। তাই তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে রিক্ততা ও রুক্ষতা আছে। তাঁর হেমন্ত শীর্ণতায় ও নৈরাশ্যের পীড়নে ধূসর রূপ নিয়ে এসেছে ; তাঁর কাব্যের নায়ক এই ঋতুর মাধ্যমেই শীর্ণ রিক্ত বিপর্যস্ত হয়েই আর্তনাদ করেছে। বার বার তিনি নৌকাচালনার কথা বলেছেন, জীবনকে অনুভব করার এবং জীবনপথে এগিয়ে চলার প্রতীক হিসাবে তিনি নৌচালনার দুরূহতাকে স্বীকার করেছেন, এবং জীবনের হতাশা ও নৈরাশ্যের বেদনাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি তরীকে কখনো ভ্রষ্ট, কখনো নষ্ট, কখনো ভগ্ন, কখনো মগ্ন করে দেখিয়েছেন। 'তন্বী' গ্রন্থ থেকেই এই নৌচালনার ছবির শুরু। ঐ গ্রন্থের 'অন্ধকার' কবিতায় কবির 'জীবন-তরী হালহারা' হয়ে 'প্রচণ্ড আবর্তাঘাতে' ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে। অর্কেস্ট্রা'র 'অপচয়' কবিতায় তাঁর যৌবন 'অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী।' 'বিকলতা' কবিতাটিতেও মগ্নতরীর ছবি দেখতে পাই—অবশ্য সেখানে তরী প্রস্তাবিত বা উপমেয় নয়, নেহাৎ উপমান—('তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো')।

ক্রন্দসীর বেশ কিছু কবিতাতেও তিনি নৌচালনার চিত্র উপস্থাপন

করেছেন, যেমন 'সন্ধান', 'উটপাখী' প্রভৃতি কবিতায়। 'উত্তর ফাল্গুনী'র 'বিলয়ে' তিনি লিখছেন—'ডুবে যায় মৃত্যুতরী জনহীন দ্বীপের সংঘাতে'। 'মরণ তরণী' নামের কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য।
'সংবর্তে'-র 'জেসন' কবিতায় দেখি—

ঘটে অন্তর্জলি
শতচ্ছিদ্র তরণীতে ; কিন্তু ভাবি অকূল পাথারে
স্বেচ্ছায় চলেছি ছুটে।

(জেসন)

এই কবিতাতেই আরো আছে ভাঙা হাল ধরে থাকা এবং ছেঁড়া পাল খাটানোর কথা। 'যথাতি'-তেও ভেলা ভাসাবার কথা আছে। 'উন্মার্গ' কবিতাতেও নৌচালনার কথা আছে, ঢেউ গুণে গুণে কবির বেলা কেটে যাচ্ছে। 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাতেও ময়ূরপঙ্খীর অকূলে ছোটার কথা রয়েছে।
'দশমী' গ্রন্থের দশটি কবিতার মধ্যে পাঁচটিতে ('নৌকাডুবি', 'ভ্রষ্টতরী', 'উপস্থাপন', 'প্রত্যুত্তর' এবং 'অসঙ্গতি') তরণীর কথা আছে ; যথাস্থানে কবিতাগুলির বিশদ আলোচনাও করা হয়েছে।

জীবনের রুক্ষ ধূসরতা এবং নৈরাশ্যের বেদনা বোঝাতে তিনি মরুভূমির শূন্যতাকে উপস্থিত করেছেন। মরুভূর চিত্রকল্প কবির বড় প্রিয় ছবি। আর এটিরও প্রথম সাক্ষাৎ মেলে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'তে, আর আছে একেবারে মুখবন্ধের কবিতাতেই—

নিশ্ছায় অমিতশূন্য মরুভূমি মাঝে
অন্তিম সম্বলসম দিশাহারা নয়নে বিরাজে॥

মরুর শূন্যতা ও শুষ্কতার প্রতীকে রুক্ষরিক্ত জীবনের ছবি ফোটাতে চেয়েছেন।
'অর্কেস্ট্রা'র 'মূর্তিপূজা' কবিতায় 'শূন্যচক্রবালে দুরত্যয় মরুকুঞ্জে'র কথা রয়েছে। 'অনুষঙ্গ' কবিতায় উপমেয়রূপে পাই—

নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম

ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া-সম।

'সঞ্চয়' কবিতাতে মরুভূমির ব্যবহার অনিবার্যরূপেই হাজির হয়েছে,—মরু এখানে উপমান—

কীর্তির সমাধিস্তূপ, স্বত্বশূন্য, মুক্ত মরুভূমি

যার পরে

অবৈধ প্রবৃত্তি মোর অবাধে বিচরে

অবলুপ্ত ধন-রত্ন-আশে।

এই গ্রন্থের 'বিস্মরণী' কবিতাতেও মরু বাতাসের কথা পাচ্ছি। অর্কেস্ট্রা' নামের কবিতাতেও দেখি—

'একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে ;

সামনে মরু অস্থিসমাকুল।

'উটপাখী' সুধীন্দ্রনাথের অতিবিখ্যাত কবিতা, মরুভূমির প্রতিকতায় মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। 'ক্রন্দসী' গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 'জাদুঘর' কবিতায় রুক্ষ ধূসর জীবনের ছবি ফোটাতে তিনি বললেন—

মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই জাদুঘরে

রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে।

'প্রত্যাখ্যান' কবিতাতেও আছে ঊষর মরুর কথা—যেখানে স্তরে স্তরে কঙ্কাল সাজানো আছে। 'বর্ষপঞ্চক' কবিতায় পাচ্ছি—'পঞ্চবর্ষ অতিক্রান্ত, মরুপথ ধূলায় আকুলি'। 'কাল' কবিতায় মরুপ্রান্তের উল্লেখ কারুরই দৃষ্টি এড়াবে না। একটির উদ্ধৃতি দিই—

মোর ফণিমনসায় ধরিল যে—অপুষ্পক শীষ

এ-বিস্তৃত মরুভূর অনামিক কোণে,

ধ্বংসসার, দুর্গম নির্জনে,

তাতেও তোমার লোভ, তাতেও তোমার প্রয়োজন ?

(কাল)

কবির একরূপতা সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁর ফণিমনসার প্রতি পক্ষপাতী ব্যবহারের কথাটি স্মরণ রাখতে হবে। 'মার্জনা' কবিতাতেও আমরা বন্ধ্যা ফণিমনসার দেখা পেয়েছি—(নব বসন্তের প্রান্তে অশোকের উদ্বেল সুষমা/কখনও কি ক্ষমা মাগে বন্ধ্যা ফণিমনসার কাছে ?)

এর আগে 'অনুষঙ্গ' কবিতার যে অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেও ফণিমানসার কথা আছে—সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

'প্রতীক' কবিতায় দেখি—'ছায়াতরী বিমন্থিত, মরুমুখী প্রেতনদীপানে।'

'মৃত্যু' কবিতাতে মরুভূমি শব্দ নেই বটে, নামী মরুভূমির উল্লেখ আছে—

আজও ভ্রমে
বর্বর সিমূম সেথা সাহারা-গোবিতে।

গোবি-সাহারার উল্লেখ অবশ্য অন্য কবিতায়ও আছে, যেমন—'নিরুক্তি'।

'প্রতিপদ' কবিতায় মরুভূমি ও ফণিমনসা—উভয়েরই ছবি আছে—

শতশ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমূমে,
বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর।

'সংক্রাম' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটির শুরুতে রয়েছে—'অনাথ বিশ্বের ধ্বংসে মরুভূর নিত্য সমভাব।' 'উজ্জীবন' কবিতাতেও বলেছেন আস্তিকের পুরস্কার হচ্ছে 'নিত্য মরুভূমি।'

এবার সুধীন্দ্রনাথের ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগের বিষয়ে দু' একটা কথা বলি। তিনি বিদেশী সাহিত্যের চত্বরে বিচরণ করতে ভালবাসতেন এবং তাঁর কাব্যের নায়ক-নায়িকারা কিছু পরিমাণে বৈদেশিক, তাদের বেশভূষা ও প্রেমের ছলাকলা কিছুটা অভারতীয়, নায়িকার চুল কালো নয়, সোনালি। ভোগের চরম অবসানের পর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে নায়ক স্মৃতি রোমন্থনেই বিভোর। এই জাতীয় কথার উল্লেখ করে

সুধীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী কবি বলে থাকেন। কিন্তু এটি মারাত্মক ভুল। সুধীন্দ্রনাথের কোনো বিষয়েই ছুঁৎ-মার্গ ছিল না, এবং দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগও ছিল, ফলে বৈদেশিক কাব্য আন্দোলনের ধারার প্রতি তাঁর মুগ্ধতার প্রকাশে তিনি ছিলেন অকপট। যদিও তিনি নিজের শক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থাবান ছিলেন, তবু তিনি বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে মালার্মে-ই তাঁর অন্বিষ্ট। আমি এর আগে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছি—মালার্মের সঙ্গে তার মিল অপেক্ষা গরমিলই ছিল বেশী।

সুধীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাপোষণ করতেন, বাল্যকাল থেকেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল, রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরু বলে মানতেন, গুরুদেব ভেবে ভাবাতিশয্যে বিগলিতচিত্ত না হয়ে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতেন। ভারতীয় সমাজ-জীবনের চিন্তা, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ভাবনা সুধীন্দ্রনাথের মননে উজ্জ্বল ছিল, তাই তাঁর কাব্যে ভারতের বৃহত্তর সমাজমানসের কথা প্রতিফলিত হয়েছে—'সংবর্তে'র বহু কবি-তায়। সুধীন্দ্রনাথ কবির কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বলতেন—'ব্যক্তি-গত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবি-জীবনের চরম সার্থকতা'। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের অসহায়তার প্রতি তাঁর দরদ যেমন দেখা গেছে, তেমনি ক্রান্তিকালে গোটা জাতির জন্যে ভাবনাও তাঁকে পীড়িত করেছে। 'সংবর্ত' কাব্য এই প্রসঙ্গে চিরকালের স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিদেশী কাব্য ও পুরাণ থেকে তিনি বেশী অনুষঙ্গ উপস্থিত করেন নি, জেসন্, বিয়াত্রিচ্, ট্রয়ের কথা,—তাঁর কাব্যে খুব অল্পাংশ জুড়ে আছে, এর তুলনায় ভারতীয় পুরাণ, উপাখ্যান, দর্শন, ইতিহাসের কথা ও প্রসঙ্গ অনেক বেশী আছে। বিদেশী কাব্যের তিনি সমঝ্‌দার ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাণ, দর্শন ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর

আনুগত্য ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যাকে সংক্ষেপে বলা যায় নাড়ীর টান, সেই তীব্র অনুরাগ ছিল তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি। উপমান হিসেবে তাই তাঁর কাব্যে প্রাচীন ভারতের গল্প-পুরাণ-ইতিকথা থেকে চরিত্র এবং ঘটনাবলী উপস্থিত হয়েছে। সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করি—

(১) অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘুপদধ্বনি ?

(২) প্রতীকীর অশ্বমেধ শুধু শূন্যে অধিকার পায়,
নিশ্চিত স্বর্গের হাস্যে অপ্রতিষ্ঠ ত্রিশঙ্কু অমর ?

(৩) শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী
অন্তর্দীপ্ত উল্কাসম করপুটে পড়েছিল খসি···
অনাদ্য ওংকারনাদে জেগেছিল প্রতন হৃদয়ে
চিরঞ্জীব পুরূরবা।

(৪) কপট পাশায় পৃথিবীপতিরে বনে
পাঠায়েছ অনবত শিরে।

(৫) তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাত আমার পায়ে বেণুমুগ্ধ কালীয়ের মতো ?

(৬) উপরন্তু দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে আমার অদ্বৈতসিদ্ধি
পঙ্গু হ'য়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে।

(৭) অন্তত এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ জাতিস্মর অভিমন্যু ?

এ ছাড়া—নচিকেতা, যথাতি, দুঃশাসন, কল্কি, তিলভাণ্ড, ব্যাসকূট, ইন্দ্রত্বের টীকা, অহল্যা, জামদগ্ন্য, ত্রিশূল, রাবণ, সরমা, প্রলয়পয়োধি, ইন্দ্র, নহুষ প্রভৃতির প্রচুর উল্লেখে তাঁর কবিতা ভারাক্রান্তই বলা চলে। ভাষাকে তিনি অর্থদ্যোতনার ক্ষেত্রে সূচীমুখিতা দান করার জন্যে এই জাতীয় পরিচিত চরিত্রের উল্লেখ করেছেন এত বেশী—যাতে পাঠকের মনে হতে পারে যে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণকে মুদ্রাদোষের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি

সুধীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চিত্রণ সম্পর্কে বড় করে ঘোষণা করার কোনো কথা না থাকলেও তিনি যে প্রকৃতির উজ্জ্বল রূপকার ছিলেন না—এমন নয়। প্রকৃতি তাঁর সাহিত্যে নেই বা প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর চোখ বন্ধ ছিল, তাই সে বিষয়ে তাঁর মনে ঔদাসীন্য এবং কলমে অনীহা ; ঘটনা কিন্তু এসব কথা প্রমাণ করে না। তাঁকে সমালোচকেরা মননের কবি এবং যুক্তির পথে বিচরণশীল চিন্তাবিদ্ বলে বর্ণনা করেছেন। গদ্যধর্মী কাব্যে, যুক্তি-আশ্রয়ী মেজাজে যিনি দীক্ষিত, তিনি বহুক্ষণ ধরে প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করে উপভোগবাসনায় নিবিড় নৈকট্য লাভ করেন নি, কিংবা প্রকৃতিকে যতটুকু দেখেছেন এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছেন—ততটুকু বর্ণনা করার কোমল পেলব ভাষা তাঁর হাতে আসে নি, তাই প্রকৃতি বীক্ষণের বর্ণনা কাব্যে অপেক্ষাকৃত কম, তা বলে এত কম নয় যে তাঁকে প্রকৃতি-প্রেমিক বলা যাবে না।

আকাশনক্ষত্র, নদনদী, ঝঞ্ঝা বায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেমন তাঁর কাব্যে অনায়াসেই এসেছে, তেমনই আছে বিবিধ রঙের পুষ্পের উল্লেখ, শিউলি-পলাশের অঞ্জলি সাজানো, রজনীগন্ধার যষ্টির উদ্ভাস, অশোক মালতীর বিকীর্ণ সৌন্দর্যের কথা, আষাঢ়-শেষে কদমফুলের ফুটে ওঠা, এমন কি লাইলাকের বর্ণনাটিও এ প্রসঙ্গে মনে না পড়ে পারছে না! ধূসর মরু-ভূমির ছবি, রুক্ষ প্রান্তরের বন্ধ্যাত্ব—যত্রতত্র দেখা যাবে। হেমন্তের বীতশ্রী প্রকৃতির রিক্তরূপের বিবর্ণতাও তাঁর প্রকৃতি বর্ণনার অংশ হয়েছে, কিছু ঋতুরূপের কথাও আছে। তবে সর্বত্র কবি সংযতভাবে প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন, কখনো অল্প কথায়, কখনো ইঙ্গিতে ; আর প্রকৃতির ছবি আঁকতে হবে—এই ব্রত বা মনোভাব নিয়ে তিনি প্রকৃতি-চিত্রণে মনোযোগী হন নি। কবিতার পটভূমি হিসেবে কখনো কখনো

কাব্যের মূল ব্যক্তব্যকে উপস্থাপনের হাতিয়ারস্বরূপ, কখনো বা উপমানের সৌন্দর্য রচনার দায়িত্ব নিয়েপ্রকৃতি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে হাজির হয়েছে।

ফাল্গুন অঙ্গনে মোর ছড়ায়েছে অশোক পলাশ।
দক্ষিণের বাতায়নে কৃষ্ণচূড়া হেনেছে বৈশাখ।
জাগায়ে মেদুর মেঘে চপলার চকিত বিলাস
বিকচ কদম্বকুঞ্জে আষাঢ় দিয়েছে মোরে ডাক॥

শেফালীরঞ্জিত হস্তে নবান্নের নৈবেদ্য এনেছে
অতিক্রমি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন।
কাননে ছড়ায়ে সোনা উদাসী অঘ্রান চ'লে গেছে।
পৌষের পাথেয় দিতে সর্বহারা হয়েছে বিপিন॥

বসন্তের পুষ্পিত কাননের উদ্দাম সৌন্দর্য, গ্রীষ্মে ফুটে ওঠা কৃষ্ণচূড়ার অগ্নিসদৃশ রক্তরাগবিলাস, কিংবা প্রস্ফুটিত কদম্বকুঞ্জে আষাঢ়ের সোহাগস্পর্শ—কবি বিলক্ষণ উপভোগ করেছেন।

একটি রাত্রির বর্ণনা দিয়ে কবি 'লঘিমা' কবিতাটি শুরু করেছেন, এবং বর্ণনায় নতুনত্ব থাকায় তার স্বাদুতা পাঠকমাত্রেরই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে—

শীর্ণকায় শুক্লশশী অগাধ তিমিরে অবগাহি,
ফিরে গেছে বহুক্ষণ আপনার অখ্যাত আবাসে
অতিক্রমি চক্রবাল ; গুপ্তগতি কালস্রোতে ভাসে
বেপমান তারাদল বেগজাত বুদ্বুদের প্রায়,
মাঝে মাঝে মজ্জমান মুহূর্তের বিক্ষোভ জানায়
আবর্তিত নীহারিকা।

কালের গতি দৃশ্যমান নয়, কবি কালকে সমুদ্রের মতোই ভেবেছেন, কালের সঙ্গে সাগরের উপমায় কিছু নূতনত্ব নেই, বরং তা চিরাচরিত এবং কবিপ্রসিদ্ধির প্রথানুগ, কিন্তু যখন তিনি আকাশের তারাকে

কালস্রোতে বেগজাত বুদ্‌বুদের মতো দেখেন, যখন আবর্তিত নীহারিকা মাঝে মাঝে ডুব দিতে দিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—তখন প্রকৃতির রূপে একটা চমৎকারিত্ব এবং নূতনত্বের আমেজ জাগে !

শহরে প্রকৃতির কুণ্ঠিতরূপও কবির চোখে পড়েছে, শরতের আকাশ নিষ্প্রভ, মিলের ধোঁয়ায় শরতের নীলাকাশে ধূসরতার একটা বিষণ্ণ পলেস্তারা, শহরের তাবৎ আবর্জনা জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতকে দূষিত করেছে, চারিদিকের প্রকৃতি কেমন যেন ম্রিয়মাণ।

'ক্রন্দসী'র 'কুক্কুট' কবিতার পটভূমি হিসেবে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, তবে সেখানে প্রকৃতির কথা গৌণ, প্রকৃতি-রাজ্যের বিবিধ পাখিই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে।

সুধীন্দ্রনাথ কখনোই নিজের প্রকৃতি-প্রীতির কথা ব্যক্ত করার জন্যে মুখ খোলেন নি। আমার মনে হয় প্রকৃতিকে তিনি গভীরভাবেই ভাল-বেসেছিলেন, সেই ভালবাসা প্রচারের জন্যে তাঁর কোনো উদ্যম এবং উচ্চারণ নেই। সহজভাবে ও একান্ত স্বাভাবিক উপায়ে যে পঙ্‌ক্তিগুলি কাব্যদেহের সম্পদ হিসেবে আপনাআপনি এসে পড়েছে, প্রকৃতির প্রতি প্রীতি প্রকাশের জন্যে তাতে বাড়তি কোনো উদ্যম যুক্ত করেন নি। হেমন্ত সন্ধ্যার একটি সূর্যাস্ত বর্ণনার কথা মনে পড়ছে, সেটি লক্ষ্য করলেই আমার এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে—

> অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
> অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায়॥

সুধীন্দ্রনাথের মন মূলতঃ শূন্যতাধর্মী, তাই তাঁর ঋতুকে হেমন্ত বলে চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু হেমন্তের প্রসন্ন রূপের কবি তিনি নন। জীবনা-নন্দের হেমন্তের স্নিগ্ধতা সুধীন্দ্রনাথে নেই। নৈরাশ্যের প্রতিফলনে সুধীন্দ্রমানসের প্রবণতা রিক্ততার দিকে, তাই তাঁর হেমন্ত ঋতুতেও রিক্ততার ছবি ফুটে ওঠে। রিক্ত ধূমায়িত মাঠ, নিষ্পত্র বৃক্ষশোভিত অরণ্যবীথি, শেওলাঢাকা অস্বচ্ছ জলের দীঘি, উড্ডীন বিষণ্ণ বলাকা—

এ সবই কবিকে মুগ্ধ করে।

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্ত লোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুতপত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত॥

রিক্ততা ও নৈরাশ্য বোঝাতে তিনি মরুভূমির চিত্র এঁকেছেন—সেই মরুদেশ ফণিমনসায় ঘেরা ; নদীতে কিছু ভগ্ন ও মগ্নতরীর ছবি আঁকা আছে—তাও শূন্যতার প্রক্ষেপণ। 'বিস্মরণী' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'শর্বরী'তেও প্রকৃতির রিক্তরূপের ছবি আছে ; এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে আকাশে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বর্ণনায়ও মানসিক নৈরাশ্যের ফলশ্রুতি দেখা গেছে।

এতৎসত্ত্বেও বলি নীরব প্রেমিকের মতো প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসা তিনি স্বল্প কথায় লিখতে দ্বিধা করেন নি। তাই বসন্তকালের সুন্দর বর্ণনার অভাব নেই তাঁর কাব্যে।

গতাসু বরষে,
সহসা উঠিল জেগে নিম্বের বিপিনে
বিহ্বল চন্দনগন্ধ মলয়ের কবোষ্ণ পরশে ;
ধৈর্যহীন অপব্যয়ে বৃথা পুষ্পাঞ্জলি
বসুন্ধরা নিজেরে অর্পিল ;
বন্দ্র অলি
তালে বেঁধে দিল
সৃষ্টির স্বয়ম্ভু সামগান ;
উৎকণ্ঠিত প্রজাপতি করিল সন্ধান
অনুর্বরা প্রোষিতারে, বিরহীর চিত্রলিপি ল'য়ে ;
কে পরাল রজনীর কনক বলয়ে
উদ্বাহসিন্দুরবিন্দু গোধূলি লগনে।

ঠিক এই রকম শুধু বর্ষার মিষ্টি বর্ণনা পাই 'শাশ্বতী' কবিতার শুরুতে ;

কিন্তু কবির সেই মধুরতা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নি. বর্ষা স্মৃতি-রোমন্থনতার এক বিষণ্ন আমেজ জাগিয়েছে—

শ্রান্ত বরষা, অবহেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি ঃ
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।

প্রকৃতি আবার কখনো নায়ক-নায়িকার আলাপ ও মিলনের পটভূমি। নিদাঘের জনশূন্য দিনে কিংবা নদীর তরঙ্গ মুখর তটে বা দেওদার বনের মর্মর ধ্বনির পটভূমিতে নায়ক-নায়িকাকে দেখতে কবি ভালবাসেন। প্রকৃতির কাছ থেকে কবি শান্তি এবং তৃপ্তি পেয়েছেন, তবে তা শাশ্বত নয়, ক্ষণিক। সাময়িক সুখাবহ বলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মন মুগ্ধ হয়। এই সাময়িক শান্তি পান বলেই তিনি প্রকৃতিকে প্রায়ই উপমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন, উপমেয় হিসেবে প্রকৃতিকে বর্ণিতব্য বিষয় করে তোলেন নি।

তাঁর কাব্যে প্রকৃতির টুকরো টুকরো ছবি ইতস্তত ছড়ানো আছে অজস্র জায়গায়, সেখানেও দেখা যাবে উপমান হিসেবে প্রস্তুতির জগৎ উপস্থিত হয়েছে। কয়েকটির উল্লেখ করি—

(১) মোর ব্যর্থ যৌবনের ক্ষিপ্ত অপচয়
হিরণ্ময় শস্যের আকারে
সে-দিন ফিরিবে আমি অক্ষয় ভাণ্ডারে।

(২) তরুশিরে আন্দোলন তুলি,
ভুবনে স্তব্ধতা হানি, চ'লে যায় যথা, পথ ভুলি,
দূর দিয়ে মত্ত প্রভঞ্জন,

তেমনই এল না লগ্নে, আসি-আসি ব'লেও, মাতন।

(৩) ফুটায়েছি তপ্ত রাগ পরস্পর প্রেয়সীর কানে
মধুপ গুঞ্জনমত্ত মাধবীবিতানে।

(৪) প্রথমে যে-অলি
উচ্ছল হৃদয় সুধা ল'য়ে, গেল চলি,
স্থান তব তাদের স্মরণে।
লাঞ্ছিত ভ্রমর,
মলয়ের ভ্রষ্ট অনুচর
অকারণে
মধুরিক্ত কমলেরে করিলাম আমি প্রদক্ষিণ॥

(৫) জানি কত তরুণীর গাল
অমনই অধৈর্যভরে শতবার দিয়েছি রাঙায়ে ;
অনুপূর্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে।

(৬) ভালো লেগেছিল ওই উদ্দাম, উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্ত স্পর্শে, ধান্যসম, কেলিপরায়ণ,
লক্ষ লক্ষ মধুপের মদির গুঞ্জন
তব ক্ষিপ্র কণ্ঠের আড়ালে।

(৭) আমি শুধু সে-বাচাল ভিড়ে
স্বতন্ত্র দাঁড়ায়ে থাকি, শৈল যথা পরিচ্ছন্ন শিরে
নিষ্প্রাণ, নির্লিপ্ত রহে উদ্বেল ঊর্মির আলিঙ্গনে॥

(৮) বুঝিলাম বেলা চ'লে যায়,
দিগন্তের পটে আঁকা অস্থিসার হিম চন্দ্রমায়
সূর্যের অপরিহার্য তেজ
রচে শেষ শেজ ;
মৃগতৃষিকার প্রেত অলৌকিক মরীচিকারূপে

স্বর্গান্বেষী সোপানের ধ্বংস'ধূলিস্তূপে
কালের তাণ্ডবলীলা ঢেকে দেয় মায়ার প্রচ্ছদে।

অন্য ধরনের ছবিও দেখা যাবে; যেমন—'অলক্ষ্যে অলস নদী করে শুধু নৈশ সংকীর্তন'। কিংবা—

উদার অলকানন্দা হয়ে গেছে মহাকাশ পার
ছড়ায়ে নক্ষত্র-ফেনা ; বেঁধেছে অসংখ্য জোনাকিরে
রজনীগন্ধার গুল্ম ; সম্মিলিত তাদের ঝিঁঝিঁরে
মনে হয় অমাবস্যা সুদক্ষিণ, সজীব, নির্ভার॥

ব্যাপকভাবে না হলেও আকারে ইঙ্গিতে এবং অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় সুধীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা নায়িকার তনুগঠনের কথা বলেছেন। এ জিনিস জীবনানন্দে প্রচুর, তবু সুধীন্দ্রনাথেও সংযতভাবে দু'-একটি কথায় প্রকৃতি নায়িকার কায়িক সৌষ্ঠবে কাজে লেগেছে—এমন ছবি আঁকা আছে। সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন—

ঘাটে, বাটে, মাঠে ঘটেছে মোদের
আধো পরিচয় নিত্যনব ঃ
দেখেছি বিকচ দাড়িম্ববনে
প্রচুরপরাগ প্রসাদ তব ;
তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারই তনুর মদিরা ভরা ;
পথপার্শ্বের অপরাজিতা, সে
তোমারই দৃষ্টি লক্ষ্যহরা॥

প্রকৃতিই নায়িকার তনু গঠনে সাহায্য করেছে—এমন স্পষ্ট কথা নেই, তবু নায়িকার দেহলাবণ্যের জন্যে প্রাকৃত জগতের কিছু দাক্ষিণ্য রয়েছে।

'বিকলতা' কবিতায় নায়িকার হাতের আঙুলকে তিনি শিউলি ফুল

বলেছেন—'শেফালি অঙ্গুলি'। নায়িকার চোখের জল তাঁর কাছে—'ফলদা স্বাতির পুণ্যবারি' ছাড়া যেন আর কিছু নয়; ('নাম' কবিতা দ্রষ্টব্য)।

নায়িকার ঋজু বরদেহখানি রজনীগন্ধার যষ্টি। তার রেশমী চুলের কুঞ্চিত লহরে ভর করে থাকা অসীম রাত্রিকে কবি দেখতে পান অতি সহজে। 'মহাশ্বেতা' কবিতায় কবি নায়িকাকে প্রকৃতির রাজ্যে মূর্ত দেখেছেন।—

> বারংবার
> নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখি,
> সমস্ত ভুবন জুড়ে আবার এলে কি,
> ক্ষণিকা পরমা ?
> প্রতিবেশী পত্রে, পুষ্পে নেহারি যে তোমারই উপমা।

পার্বত্য ঝর্ণা, দক্ষিণ সমীরণপ্রভৃতির বর্ণনায় কবি এক জীবন্ত নারীমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যেমন—

> দখিন বায়ু আসি নির্ঝরিণীকানে
> ভনিল কোন্ কথা, তা শুধু সেই জানে।
> সহসা সে-সুমনা হয়েছে বিবসনা,
> অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।
> কহিল সমীরণ কী কথা কানে কানে ?

অবশ্য এই কবিতার ('অর্কেস্ট্রা'র) অন্যত্র নিছক প্রকৃতির বর্ণনাই পাই—

> ছায়াবীথি মোহে ঢাকা,
> সোনা-খচা পথখানি,
> ফুলে অবনত শাখা
> গুঞ্জরে বনবাণী॥

'জাতক' কবিতায় ঝড়ের চিত্র আছে। এ ছাড়া জলাশয়ের ও তীর-ভূমির খণ্ডিত বর্ণনার কথাও নানা কবিতায় ছড়ানো আছে। 'ক্রন্দসী'

গ্রন্থের 'মৃত্যু' কবিতার শেষে যেখানে কবি প্রকৃতির সঙ্গে লীন হবার বাসনা জানিয়ে বসুমতীর কাছে প্রার্থনা করছেন—তাকে যেন পুনরায় তার গর্ভে ফিরিয়ে নেওয়া হয়—সেখানেও প্রকৃতির কিছু সুন্দর বর্ণনা আছে। সেখানে এখনও বুঝি স্বতন্ত্রতা আছে।

এখনও দিগন্তে সেথা পরিচ্ছিন্ন হিমাদ্রি বিরাজে ঃ
এখনও নিঃসঙ্গ অন্ধকার
সপ্তর্ষির আশীর্বাদে ধন্য হয় সেথা বারংবার ;
আজও থাকি থাকি
দিগ্বিজয়ী শঙ্খে সিন্ধু তুরঙ্গমী সেনানীরে ডাকি
মানুষের প্রগল্‌ভতা ডুবায় চকিতে
অভ্রংলিহ পরাক্রমে ;
আজও ভ্রমে
বর্বর সিমূম সেথা সাহারা-গোবিতে ;
সুমেরুর দুরাক্রম্য কূটে
রূপের শাশ্বত হাসি আজও ফুটে উঠে
অতিক্রেমি সংকটের অহৈতুক ঘাত-প্রতিঘাত।
আজও তব অরণ্যে নির্বাত
নিভৃতে বিহরে যেথা নির্নিগড় শিবি,
সেথা মোরে স্থান দাও, হে পৃথিবী, পৃথুল পৃথিবী ॥

প্রকৃতির প্রতি সুধীন্দ্রনাথের প্রীতি উচ্চকিত নয়, কিন্তু খুবই উচ্চগ্রামের। প্রকৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাঁর মনোনিবেশ নেই বটে, কিন্তু পটভূমি হিসেবে যেখানেই প্রকৃতির প্রয়োজন—সেখানে ঐ প্রকৃতিকে ঐশ্বর্য-ময়তায় মুড়েই তিনি প্রকাশ করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনা

ভগবান সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ধারণা পরিবর্তনশীল চরিত্রে উপস্থিত হয়েছে। গোড়ায় দেখা যায় তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি—রবীন্দ্রনাথের মতোই, কিন্তু পরেই দেখা যায় তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগছে, ভগবানের কল্যাণকামী সত্তার প্রতি আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের মতোই কবির সংশয় উপস্থিত হচ্ছে। তিনি নিজে বলেছেন—"অল্প বয়সেই অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয় নিয়েছিলুম।" তাই 'অর্কেস্ট্রার' "বিস্মরণী" কবিতায় তাঁকে ঘোষণা করতে শুনি—

উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা
বলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা॥

এখানে জড়বাদী চিত্তেরই উক্তি ধ্বনিত হয়েছে।

'ক্রন্দসী'র "সন্ধানী" কবিতাতেও ঈশ্বরকে সামন্ততান্ত্রিক কর্তা-স্বরূপ ধরে নিয়ে কবি বলছেন যে তিনি শূন্যের পরিখাঘেরা ব্রহ্মাণ্ডের সন্তপ্ত সম্মুখে প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁর 'সম্রাট-নিষ্ঠা' তিনি বিস্মৃত হয়ে বসেছেন। এই গ্রন্থে ভগবানের ব্যর্থতায় তিনি অসহায়তা প্রকাশ করছেন অন্য একটি কবিতায়—নিষ্ঠাবান সাধারণ মানুষ যারা দুর্ভাগ্য-পীড়িত, জীবন-সংগ্রামে নানাভাবে বিপর্যস্ত—তাদের প্রতি মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা নেই, শুধু দানবের জন্যেই কি ভগবানের অনুকম্পা? এই প্রশ্ন তিনি করেছেন—

হায় ভগবান,
হায়, হায় ব্যর্থ ভগবান
তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু
অসুরের তরে?

(প্রশ্ন, ক্রন্দসী)

'সংবর্তে'র "উজ্জীবন" কবিতাতেও তিনি বলেছেন—অসহায় নিরীহ নির্দোষ মানুষই আজ শাস্তি ভোগ করছে—বিধির বিধানে ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ অবসিত।

আখণ্ডল
নিরর্থক নাম মাত্র : জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নারকী কীট ; কুলিশ প্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের মুণ্ডপাত করে ॥

(উজ্জীবন, সংবর্ত)

'অর্কেস্ট্রা'তে বিধাতাহীন বিশ্বসম্পর্কে কবির যে কল্পনার শুরু—'সংবর্তে' সেই চিন্তার সমাপ্তি। পৃথিবী অনাথ, বিশ্বে বিধাতার অস্তিত্ব নেই, তাই তিনি সহজেই বলতে পারেন—

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত :
বলেছি আমি সে-আত্মা।

(সোহংবাদ, সংবর্ত)

'সংবর্তে'র অন্যান্য কবিতাতেও ঈশ্বরের অনস্তিত্বের কথা আছে—'অনাথ বিশ্ব', 'অবিবেকী অন্তর্যামী' (সংক্রাম),' অপমৃত ভগবান' (জাতক-১), 'ঐশ্বর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ' (বিপ্রলাপ)।

সুধীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে নানা দলের প্রতিভূ বলেই ধরে নিয়েছেন, যাযাবর আর্যেরা ঈশ্বরকে একরকম দৃষ্টিতে দেখেছেন ('যাযাবর আর্যের বিধাতা') ইহুদিরা সেই দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে দেখেন নি ('য়িহুদির হিংস্র ভগবান'), কুলীনেরা আবার অন্যভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেছেন ('কুলীনের কল্পিত ঈশান')।

আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধি সমন্বিত দীপ্ত মনের মানুষ ভগবানকে অলীক বলেই ভাবেন। তাই কবিও ঈশ্বরকে 'অতীতের অলীক আত্মীয় ভগবান' বলে ভেবে নিয়েছেন। মানুষের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ছিল কল্পনাভিত্তিক, বিজ্ঞান এসে সেই কল্পনার টুঁটি টিপে ধরে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সমাধানে ব্যস্ত হলো, আধুনিক মন বুঝতে পারলো—অক্ষম অসহায় ভীরুচিত্ত

মানুষই তার অসহনীয় দুঃখে ও চরম দুর্বলতায় ঈশ্বরকে ক্ষেমঙ্কর ও সান্ত্বনাদাতার পবিত্র সিংহাসনে স্থাপিত করেছে। বর্তমান যুগ তাই নিবিড় নাস্তিকতায় মুখর, ঈশ্বর অতীতের অলীক ভগবানে পরিণত। একই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 'ক্রন্দসী'র "প্রার্থনা" কবিতায় ঈশ্বরের কল্পিত সত্তার কথা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে ভাবতে পারেন নি, তিনি এক এক দলের কাছে এক এক নিরিখে চিহ্নিত, মানুষ তাঁকে তুষ্ট করে নিজের বাসনাকে সফল করে নিয়েছেন, সেই ঈশ্বরের কাছে তাই কবির কোনো নিবেদন নেই—

নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান॥ (প্রার্থনা, ক্রন্দসী)

সুধীন্দ্রনাথ নাস্তিক কবি বলেই স্বীকৃত হয়েছেন, এবং তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই—সকলেই এমন কথা বলেছেন। ঈশ্বরচেতনা নিয়ে তাঁর লেখা কবিতার সংখ্যা একেবারেই মুষ্টিমেয়, এবং সেই ক'টি কবিতা থেকে কিছু পরিচিত পঙ্‌ক্তি তুলে বার বার বলা হয়েছে তিনি জড়বাদী, ঈশ্বর সম্পর্কে অবিশ্বাসী। কিন্তু দুএকটি কবিতায় তিনি যে-ভাবে ঈশ্বরের কাছে আর্ত আবেদন রেখেছেন, সাধারণ মানুষের হয়ে ওকালতি করেছেন—তাতে মনে হয় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে কোথায় একটু বিশ্বাসভূমি ছিল। 'উজ্জীবন' কবিতায় তিনি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছেন—

ওই শোনো,
নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর, শোনো

অতিদৈব দেউলের প্রতিধ্বনি প্রহত গম্বুজে
উদয়াস্ত তোমাকেই খুঁজে,
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাস-রূপে।
(উজ্জীবন, সংবর্ত)

যদি তিনি ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হতেন তা হলে এমন একান্ত করে কি ঈশ্বরের কাছে আবেদন রাখতে পারতেন? নির্দোষ আজ প্রহৃত, 'কুলিশ প্রহার কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের 'মুণ্ডপাত করে'—তাই দেখে কবির যে জিজ্ঞাসা—'অদৃশ্য অম্বরে তবুও অদৃশ্য তুমি?'—এই আন্তরিক সুর কবির আস্তিক্য-চিন্তা সম্পর্কে আমাদের কাছে কি নতুন কোনো ভাবনা সূত্রের সন্ধান দেয় না? ক্রন্দসী'র "প্রত্যাখ্যান" কবিতায়ও তিনি পাপীর বিনাশকল্পে ভগবানকে আকুল আহ্বান জানিয়েছেন।—

ভগবান, ভগবান, য়িহুদির হিংস্র ভগবান,
ভুলেছ কি আজি দুঃশাসনে?
ধেয়ে এসো
এলায়ে বিশাল জটা, অরুন্তুদ অশনি আস্ফালি,
ধেয়ে এসো চণ্ড ক্ষোভে দ্বৈরথ সমরে।

বিধাতা অতীত শতাব্দীর চিন্তার ফসল, আজ তাঁর কাছে কোনো প্রার্থনা করে লাভ নেই. ঈশ্বরকে মানুষ বানিয়েছে ক্রীতদাস করে, তাঁর কাছে মানুষ দুঃখে দুর্দশায় সান্ত্বনা দেবার দাবী জানিয়েছে, তিনি তা পালন করেছেন; যেটি যখন দরকার হয়েছে—সেটি দান করার জন্যে তাঁর কাছে আদেশ গেছে—তিনি সে হুকুম তামিল করেছেন—একদিক থেকে দেখলে ঈশ্বরকে মানুষ ক্রীতদাস করে ফেলেছে। বন্দী দানবের কাছে যেমন আদেশ মাত্রই কাজ আদায় হয়, ঈশ্বরের কাছেও কতকটা সেই আব্দার চলেছে। সুধীন্দ্রনাথ কখনো কখনো 'অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা'র কাছ থেকে 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' ফিরে পেতে

চেয়েছেন—

যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কর্মঠ বৃত্তির অহংকারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারংবার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

(প্রার্থনা, ক্রন্দসী)

ঈশ্বরকে নিয়ে কবি এখানে ব্যঙ্গও করেছেন—পূর্বপুরুষের মতো ঈশ্বরের নামে বলি দিয়ে মাংস ভক্ষণের স্পৃহাকে আঘাত হেনেছেন, যা-কিছু অন্যায়, শক্তিমানের আচরণীয় দুর্নীতি—সবই যেন ইচ্ছাময় ভগবানেরই ইচ্ছার অভিব্যক্তি বলে মানতে পারি। লোভার্ত চিত্তে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে যে উদ্বৃত্ত কড়ি জমাই—তাও ঈশ্বরেরই দান বলে গণ্য করি। ভগবানের প্রতিভূ সেজেই তাবৎ অপকর্ম করি।

শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর, নিষ্কাম প্রসবে

ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ সেজে উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
উর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাসরি,
দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?

(প্রার্থনা, ক্রন্দসী)

এই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় কি সুফল হবে ? তাই তাঁর প্রার্থনা—

নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান।

(প্রার্থনা, ক্রন্দসী)

ঈশ্বরের কাছে এই জাতীয় দাবীর জন্যে সন্দেহ হয় যে কবির মনে বোধহয় ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো বিশ্বাসের সূত্র সুপ্ত হয়ে থাকতেও পারে।

'ক্রন্দসী' গ্রন্থের আর একটি কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। কবিতাটির নাম "পরাবর্ত"। ঐ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি লক্ষ্য করলেও আমরা দেখবো কবি সাধারণ মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতি একেবারে অমর্যাদা দেখান নি। মানুষ যাকে দেবতা বলে এসেছে, যে সর্বশক্তিমানের অর্চনা করেছে—ইন্দ্রিয়গোচর কোনো রূপময়তার সাহায্যে তাঁকে কেমন করে বিষাক্ত বিদ্রূপ হেনে একেবারে স্বর্গচ্যুত করা যাবে ? ঈশ্বরের রূপ গড়ার মোহকে ধিক্কার হানলেই কি ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক সত্য বোঝা যাবে ? ঈশ্বর সম্পর্কে পৌত্তলিকের যে মনোভাব,

নিরুপাধিক সৌন্দর্যের সম্পর্কেও কবির সেই মনোভাব—এ দিক থেকে ও পঙ্‌ক্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় যদি এটিকে ব্যঞ্জনাগভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকী বলে ধরে নিই, আমরা আপাতত সে ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না) এই প্রশ্নও কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের নাস্তিকতা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে। ঈশ্বর আছেন, তিনি মঙ্গলময়—এমন স্পষ্ট কথা তিনি উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেমঙ্কর রূপ দর্শনের জন্যে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং নির্দোষের লাঞ্ছনায় ব্যথিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে খুব যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন—কেন তিনি নিরাসক্ত। এই কারণেই আমার মনে যেটুকু সন্দেহের বাষ্প জমেছে—তার কথা বললাম।

অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা অবশ্যই হয়—যখন খুব সাধারণ ভাবে তাঁর ঈশ্বর-ভাবনার কবিতাগুলি পড়ি। সেই ধারণা হলো এই যে ভগবান শুধু নাম সর্বস্ব অক্ষম প্রতিষ্ঠান বিশেষ, কোনো অন্যায়ের প্রতিকার ঈশ্বর করতে পারেন না, পৃথিবীর সর্বনাশ রোধেও তাঁর ক্ষমতা নেই। মানবের দুঃখসুখের কাছে বিধাতা সমানভাবেই উদাসীন। 'সংবর্তে'র 'বিপ্রলাপ' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই কবি বলেছেন—"হয়তো ঈশ্বর নেই ; স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ।"

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা

সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছিলেন নিশ্চিত সত্য হিসেবে, জীবন থেকে পালিয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় চান নি। মৃত্যু অমোঘ—মৃত্যুর নিশ্চয়তায় কোনো সন্দেহ নেই, কারুর রেহাইও নেই। প্রেম, বন্ধুতা, স্মৃতিবিলাস—সবই মৃত্যুতে শেষ হয়, বিশ্বজগৎ ছুটে চলেছে মৃত্যুকে লাভ করতে, এই জগতে সম্মোহিত মানুষেরও তাই গত্যন্তর নেই নাস্তিগর্ভ মৃত্যুর শোষণের কাছে আত্মসমর্পণ না করে। মনে মনে মৃত্যুকে মানুষমাত্রেই নিশ্চিত পরিণাম বলে জানলেও দেহকে তবু আরামে বিলাসে তাতিয়ে ও মাতিয়ে রাখতে চায়। প্রেমের পরিণতিতে তাই মনের তৃপ্তি বা অতীন্দ্রিয় দ্যুতি অপেক্ষা দেহোপভোগের তীব্র সুখই কাম্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই চিন্তার আলোকে সুধীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার কথা মনে করা যায়, তাহলে তাঁর মৃত্যু-ভাবনার কথা কিছু স্পষ্ট হবে।

মৃত্যুই একমাত্র সত্য, মৃত্যুই যেন ভুবনে নিশ্চিত, বিশ্বপ্রকৃতিতে সর্বত্র মৃত্যুরই লীলা—

> গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ;
> বস্তুব দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে ;
> কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্ধনে ॥ (দ্বন্দ্ব)

এই মৃত্যুর কাছে সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ প্রভৃতি শুধু স্বপ্নেই সম্ভব, বাস্তবে এদের অর্থ নেই ; আমাদের খিন্ন মন মৃত্যুর কাছে হার মানলেও দেহ অক্ষম উৎসাহে বাসনার সেতু বেয়ে ভোগোন্মত্ততায় বড় থেকে 'তন্ময় মুহূর্তমাঝে অনন্তের আবির্ভাব' চায়। মন মৃত্যুকে সমাপ্তি জানে, দেহ ভোগবাসনার সার্থকতা বোঝে—এই দ্বন্দ্ব নিয়েই 'দ্বন্দ্ব' কবিতা।

মৃত্যুচেতনার আলোকে অনেকেই 'মহানিশা' কবিতাটিও বিচার করে-ছেন। সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে সম্বোধন করেই কবিতাটি আরম্ভ করেছেন। 'অর্কেস্ট্রা'র শীর্ষনামের কবিতাতে তিনি 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা' বলেছিলেন, এখানেও মৃত্যুর ধ্রুবত্বকে ঘোষণা করলেন—তবে কিছুটা মধুরভাবে। নৈরাশ্যপীড়িত কবির কাছে মৃত্যুচেতনা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত, কিন্তু 'মহানিশা' কবিতার বৈশিষ্ট্য এর মাধুর্যে। মৃত্যু জীবনে নিশ্চিত, একে চিরকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তবু কবির সেই অমোঘ বেদনার উপলব্ধি প্রিয়তমার সঙ্গে রভসলীলার আশ্লেষের সঙ্গে একাত্মক হয়ে উঠেছে। প্রেয়সীর প্রেমালিঙ্গন যে ভঙ্গুর, একান্ত নশ্বর, মৃত্যুর ছায়া যে তাতে প্রতিফলিত ছিল—কবির স্মরণে তা জাগছে। সেই মধুর স্মৃতির সমাপ্তিই ঘটাক এই মহানিশা।

> কী জানি, হয়তো, কেবলই স্বপন দেখি,
> ফুরাবে সকলই প্রাতে। (মহানিশা)

প্রেয়সীর আশ্লেষেও মৃত্যুর অমোঘতার আভাস পান।

'বিলয়' কবিতাতেও 'অমোঘ মরণের কথা আছে। প্রেম ভালবাসার চিরন্তন স্মৃতি বলে কিছু থাকে না, চারিদিকেই নাস্তি। প্রেমে যতই স্বর্গীয় সুষমা আরোপ করা হোক—আসলে জৈবিক।

> প্রণয়ের জয়স্তম্ভ ঠেকে গিয়ে যদিও ত্রিদিবে,
> বদ্ধমূল ভিত্তি তার তবু কাম-কারণ কর্দমে ; (বিলয়)

এই প্রেমের স্মৃতি যতই উজ্জ্বল হোক, প্রেমের দৃশ্য থেকে প্রস্থানের সময় যতই মন্দারমালা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হোক—তাও মৃত্যুতে মুছে যাবে।'

> ডুবে যায় মৃত্যুতরী জনহীন দ্বীপের সংঘাতে ;
> জন্মপরম্পরামাঝে অমৃত সে খুঁজেছিল তাই,
> স্থাপিতে পারে নি আস্থা নিরালম্ব, নশ্বর আত্মাতে॥ (তদেব)

প্রেয়সীর কালো চুল তুষার ধবল হবে, ধুলোয় শুকিয়ে যাওয়া রজনী-গন্ধার ডালের মতো তনুদেহ বিনষ্ট হবে, রতিপরিমল উবে যাবে, অব-

শেষে শুনতে হবে মৃত্যুর সঙ্কেত। অতএব নায়িকা যদি যৌবন-পূর্ণিমার নায়ককে প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে তনু উপহার দিত—তবে আজকের এই বিলয়ে কি কোনো পরিবর্তন ঘটতো? নিশ্চয়ই না। সেদিনও মরণ তাঁর তাঁর থাবা নিশ্চিতভাবেই পেতেছিল।

মৃত্যুকে বাধা দেবার উপায় নেই, মৃত্যুতরী জীবনের ঘাটে এসে ভিড়লেই তাতে সব কিছু তুলে দিতে হবে, এ প্রান্তের তীরভূমির পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে, কারণ কবির মতে জীবনের সার কেবল—মৃত্যুকে খোঁজা। মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করায় কোনও দ্বিধা নেই, মৃত্যুর শরণ নিতেও তাই তাঁর আকুলতা—

চরণে শরণ মাগি, হে মরণ ;
নাও, যা করেছি জমা॥

বন্ধু, এবার বোলো না, বোলো না,
'ঠাঁই নেই ভরা নায়ে'।
দোলাও ঢেউয়ের দোদুল দোলনা
আমার অচল পায়ে॥ (মরণ তরণী)

মৃত্যুই শেষ, মৃত্যুই নির্বাণ—তবু স্বপ্ন থাকে; উন্মুখ মৃত্যুর প্রান্তে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শর্বরীর সাজানো আরতি দীপের আলোকমালা চোখে পড়ে।

উন্মুখ মৃত্যুর প্রান্তে উর্ধ্বমুখে দাঁড়ায়েছি এসে ;
সিন্ধুর ভাস্বর আঁখি খোঁজে মোরে নিম্নে নিরুদ্দেশে ;
আমার আরতিদীপ মহাশূন্যে সাজায় শর্বরী॥

সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা ;
প্রশান্তি দক্ষিণে, বামে ; জনহীন অন্তর, বাহির।
তবু কার আবির্ভাবে কণ্টকিত আমার শরীর ;
অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা? (সৃষ্টিরহস্য)

মৃত্যুর মাধ্যমেই চরম মুক্তি মেলে—বলে তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন

—সে চিন্তাকেও তিনি অকাট্য বলে ভাবতে পারেন নি, মৃত্যুই পরম নিশ্চয়, অমোঘ সত্য—এই মতের ব্যত্যয় দেখা গেল 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায়—ইন্দ্রিয়লালিত আনন্দোপভোগও কম সত্য নয়।

অধোমুখ আকাশের পানপাত্র থেকে
আবার মাথায় ঝরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী
সুরাসম স্বচ্ছ, ফেনোজ্জ্বল। (প্রত্যাখ্যান)

মৃত্যুকেই কবির, 'স্বপ্নগর্ভ' মনে হচ্ছে, তিনি সে ধরনের মৃত্যুর আর প্রত্যাশী নন,যে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের বিহ্বল বিলাপ বেজে উঠবে—তা তিনি চান না, তিনি এখন 'নির্গুণ নির্বাণ' চান। অবশ্য এই নির্বাণের যে কি স্বরূপ, সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে কিছু না বললেও 'মৃত্যু' কবিতায় তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লীন হয়ে মিশে যেতে চেয়ে বসুমতীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

তোমার প্রমাদে
হে বসুধা, আবার ফিরায়ে লও মোরে। (মৃত্যু)

প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে মিশে যাবার বাসনাই যে 'নির্গুণ নির্বাণ'—এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি? কবির মৃত্যু ভাবনার ইঙ্গিতবহ আরো অনেক কবিতা আছে, সেগুলি গ্রন্থের কবিতাবলী আলোচনার সময় তাঁর মৃত্যুচেতনার দিকটিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ক্ষণবাদী সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথের ক্ষণবাদী চিন্তা নিয়েও অনেক সমালোচক পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যকে দর্শন শাস্ত্রের হাতিয়ার করতে চান নি। তিনি দুরূহ শব্দের সাহায্যে কাব্যের বক্তব্য ও বিষয়কে সহজবোধ্য করেন নি, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে নিষ্ঠাভরে প্রকাশ করার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না, কখনো কখনো বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে হলেও পাঠকের পক্ষে তাঁর অনেক কবিতার বিষয়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে, এই জন্যেও তিনি গভীর তত্ত্বেও দার্শনিক কবি বলে আখ্যাত হয়ে থাকবেন। শব্দের দুরূহতার জন্যেই বোধহয় তাঁর কাব্য বিমূর্ত চিন্তাযুক্ত বলে অনেকেই ভেবে থাকেন—এবং সেই কারণে দার্শনিকতার একটা আমেজের আরোপ করে থাকেন।

সুধীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী কবি—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'অর্কেস্ট্রা'য় প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী' ('জানি মুগ্ধ মুহূর্তের অবশেষ নৈরাশে নিষ্ঠুর' ইত্যাদি) পড়লেই যে কোনো পাঠকই তা লক্ষ্য করবেন। কবির উপলব্ধিতে প্রেমের কোনো শাশ্বত আবেগ ও আবেদন নেই।

তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে ক্ষণবাদী চিন্তা খুব বেশী প্রকট হয়েছে। প্রেমের কোনো চিরন্তন ফলশ্রুতি তিনি বিশ্বাস করতেন না, নায়িকার দেহমিলনে এবং সেই মিলনজনিত সুখেই তাৎক্ষণিক প্রেমের মূলোৎপাটন ; শাশ্বত দ্যোতনায় তাঁর কোনো নায়িকার পরিচয় নয়, ক্ষণিকা বলেই তাদের চিনতে হবে। তিনি ক্ষণিকা বলেই সম্বোধন করেছেন—

> হে মোর ক্ষণিকা,
> তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।

কিংবা,

> মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
> স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার ঃ

বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার,
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।

অথবা,

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসংগত চিরপ্রেম।

এই ক্ষণবাদেই কবির আনন্দঘন বিচরণ, ক্ষণিক মোহের রঙীন স্বর্গেই তিনি তাৎক্ষণিক তৃপ্তির গর্বে মশগুল। কবির কাছে যৌবনও ক্ষণিক, ফাল্গুনের বসন্তোৎসবও ক্ষণিক। সবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন— 'দশমী'গ্রন্থের 'উপস্থাপনে' যে তিনি ক্ষণবাদী—

আমি ক্ষণবাদী ; অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে সংসারও।

সুধীন্দ্র-কাব্যে প্রেম

ক্ষণবাদী চিন্তার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের বিষয়েও আমাদের কিছু ভাবনা ধরে নিতে হবে। তার আগে কবির প্রেমের কবিতার একটি বিশিষ্ট প্রকরণ সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার।

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলি এক একটি নাটকীয় স্বগতোক্তির মতো উপস্থিত হয়েছে। তিনি সর্বদা dramatic monologue-এর ঢঙটি ব্যবহার করেছেন ; সব কবিতাই যেন নায়ক একাকী স্বগত ভাষণ করেছেন মঞ্চাসীন অভিনেতার মতো। সেই ভাষণ যেন কখনও পাঠকের কাছে বিবৃত, কখনো নায়কের একান্তভাবে আপন মনের কথা, আবার কখনো তা দৃশ্যে অনুপস্থিত নায়িকার উদ্দেশ্যে উক্ত। কখনো বা নায়ক নিজের স্মৃতি রোমন্থন করছেন বিষণ্ণ চিত্তে কখনো বা সুখের স্মৃতিতে বিহ্বল হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। আবার কখনো নায়ক নায়িকাকে নিজের কথা বলে চলেছেন প্রেমের আনন্দ-বেদনার উপলব্ধিতে বিহ্বল হয়ে। এই প্রকরণটি মনে রেখে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি পড়তে হবে।

তাঁর প্রেমের কবিতায় কোথাও সলজ্জ বা সকুণ্ঠ অভিব্যক্তি নেই ; প্রেমের বিবিধ বোধের প্রতি তাঁর সৎ নিষ্ঠান্বিত প্রত্যয়কে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন, প্রেমের মধ্যে কামের সম্পর্ক কতটুকু এবং কামের তাড়নায় প্রেমের অপমৃত্যু—সে কথা বলতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। আবার প্রেম ও প্রেমের অমৃত যন্ত্রণা—সে সম্পর্কে লিখতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেতনায় মালিন্য নেই, ভোগের আবিলতায় সে প্রেম পঙ্কিল হয় নি, তাঁর উত্তরসূরী সুধীন্দ্রনাথ প্রেমের ভোগ-সলিলে মগ্ন, কিন্তু পঙ্কে পতিত নন, প্রেমের অমৃত সন্ধানে ব্যস্ত না হয়ে তিনি ক্ষণমদির দৈহিক তৃপ্তিলাভে ইতি টেনেছেন, এবং তার স্মৃতি-

আতুরতায় ব্যথিত বোধ করেছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমকে বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হন নি, বহুবল্লভা নায়িকার সঙ্গে ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি-কথনেও পরাঙ্মুখ নন। প্রেমের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অধরার বস্তু-অতীত আনন্দ-কল্পের সন্ধান তিনি করেন নি। অসঙ্কোচে প্রেমের আবেগ ও তার প্রকাশ ব্যক্ত করেছেন, এবং সচরাচর প্রেম বলতে লোকে যা বোঝে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতেও কবি দ্বিধা করেন নি, অর্থাৎ প্রেমের পরিণতি জৈবিক কামনায় এবং সর্বশেষে সেই মধুর স্মৃতিকে রোমন্থন করার মধ্যে। সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কাব্যে সেই বক্তব্যের সগৌরব অভিব্যক্তি দেখা যাবে। তাই তাঁর কাব্যে নায়ক প্রৌঢ় এবং একসঙ্গে বহু নায়িকা প্রিয় বাঞ্ছিত ব্যক্তি। আর নায়িকারা বহু ঘাটে নাও ভিড়িয়ে অনেক চতুরালিতে পারদর্শিনী হয়ে এসেছে। সেই নায়িকা-কুলের কেউ বা বিদেশিনী, আর কেউ বা স্বদেশবাসিনী। নায়ক যতটুকু দেহ-মদিরা পান করতে পারে, ততটুকুই সে গ্রহণ করে খুশি হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় নারীর কথা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পুরুষের প্রেমে নারী, ভোগে নারী, আলাপে নারী, রাজনীতির অবকাশে নারী, হোক না নারীর তৃপ্তিদায়ী ক্ষমতা ক্ষণিকের, তবু সেই ক্ষণমদিরার স্বাদ-গ্রহণ তো মিথ্যা নয়, তুচ্ছ নয়। চারিদিকে শূন্যতা, নৈরাশ্য, অন্ধকার —তবু তার মাঝে নারী সত্য, নারীই সেই শূন্যতায় পুরুষের হাত ধরে অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনাহূত প্রেতস্তব্ধ গৃহে এসে উপস্থিত হয়—

> চির মোহ-ময়,
> তুচ্ছ, প্রয়োজনহীন বাক্য-কতিপয়
> চুম্বনের অবকাশে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করি,
> দিলে ভরি
> নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।

সুধীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা স্মৃতি-রোমন্থনে বিধুর। ক্ষণবাদী কবির মনে প্রেমের উচ্ছ্বাসের ফেনা স্মৃতির বেদনায় এখনো বর্ণাঢ্যতা জাগিয়ে

রাখে, সম্ভোগ-সুখের মুহূর্তগুলির স্মরণের পথে এখনো আনন্দের বোধ জাগিয়ে তোলে, যৌবন চিরকালের জিনিস নয়, তা একদিন অপচিত হয়, সে ত' ধ্রুবতারা নয়, আলেয়ার মতোই তার দশা, তাকে শাশ্বত ভাবা ঠিক নয়। তবু কবি প্রেমিকাকে ভুলে যাবেন, নায়িকাও তাঁকে ভুলে যাবে—

> তুমিও উধাও হবে, সঙ্গে ল'য়ে অন্তিম সান্ত্বনা—
> স্মৃতির সমষ্টিখানি অবিচ্ছিন্ন, অনির্বচনীয় ;
> যাবে স্তূপীকৃত করি মূল্যহীন ভগ্ন আবর্জনা
> পরিত্যক্ত হৃদয়ের কোণে কোণে আঁধারে তুমিও ॥
> তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় ;
> মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব ;
> হরিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃত সঞ্চয় ;
> সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব ॥

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমে বেদনার স্পষ্ট প্রকাশ আছে—তাঁর কাব্য প্রেম বিরহ এবং বিচ্ছেদেই শেষ হয়েছে। আর এই বিরহ ও বিচ্ছেদ থেকেই নৈরাশ্য জাগে ; সুধীন্দ্রনাথ নৈরাশ্যবাদী কবি – তাই তাঁর প্রেমের পরিণতিও এই দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ বলা চলে।

প্রতীক-চেতনা

সুধীন্দ্রনাথের প্রতীক-ব্যবহারের প্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে এখানে একটি কথার উল্লেখ করা উচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংবেদন এবং সাহিত্য-প্রকরণের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইংরাজী ভাষায় তদানীন্তন বাঙালীদের দক্ষতাবিষয়ে বোধহয় কিছু বলার দরকার নেই। সেই ভাষা শিক্ষার দৌলতে ইংরাজী সাহিত্য-মন্থনের সুযোগ অনেকের ভাগ্যে জুটেছে, এবং ইংরাজী ভাষার অনুবাদ সাহিত্যের সমৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের আশীর্বাদ লাভও বাঙালীর ভাগ্যে জুটেছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ দিক্‌পাল সাহিত্যিকদের রচনার মৌল আবেদন বাঙালীর হৃদয়কেন্দ্রিক হলেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষ, বিদেশীয় সাহিত্যের রীতি, ইয়োরোপের বিজ্ঞান-ভাবনা, ধর্ম-চিন্তা—এক্ কথায় তদানীন্তন বিশ্ব-চিন্তার একটি স্বাক্ষর তাঁদের রচনায় উঁকি দিয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা এবং ইয়োরোপীয় তাবৎ শিল্পচেতনাকে এদেশের বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্যেই 'পরিচয়' কাগজ বের করেছিলেন। ভারতীয় চিন্তাধারার পটভূমিতে পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতকে উপস্থিত করে বাঙালীর কাছে ইয়োরোপীয় শিল্প-মানসকে পরিচয় করানোর ব্রত সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের এক অনন্য কীর্তি। তাই তিনি ভারতীয় সাহিত্যের দিক্‌পাল কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে যত না আলোচনা করেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী বিদেশী কবিদের পরিচিত করাবার জন্যেই তাঁদের সম্পর্কে লিখে গেছেন। তিনি ইংরাজী, ফরাসী এবং জার্মান ভাষার কবিদের কিছু পরিচয় উপস্থিত করেছেন, এবং এইসব বিদেশী কবিদের রচনাপাঠ তাঁর নিয়মিত রুটিনের মধ্যে ছিল, এবং কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই তিনি উনবিংশ শতকের এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে—বিশেষ করে ফরাসী কাব্যে এবং

পরে ইংরেজী কাব্যে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে—তার তাৎপর্য বুঝেছিলেন এবং সেই কাব্যান্দোলনের প্রতীকতা, রূপারোপের নবত্ব প্রতীক-চেতনার ব্যবহারে স্ফটিক-কাঠিন্যের আমদানি প্রভৃতি সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতাকে বাংলা কাব্যসৃজনের মূলধনের পুঁজিতে যোগ করিয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও প্রতীকতা দেখা যায়। তাঁকে সুররিয়ালিস্ট কবি বলে পুরোপুরি চিহ্নিত করতে না পারলেও—তাঁর কাব্যে প্রতীক-ব্যবহারের মাত্রা বরং কিছু বেশীই হবে। তাঁর বিখ্যাত 'উটপাখী' কবিতাটির কথাই ধরা যাক—ধ্বংসোন্মুখ অবক্ষয়ী জীবনের বন্ধ্যাত্ব বোঝাতে তিনি সেখানে মরুভূমির ছবি এঁকেছেন, মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের অসহায় অবস্থার কারুণ্যকে প্রকাশ করতে চায় না, নিজের মর্মন্তুদ বেদনাকে অন্যের মনোযোগ থেকে লুকিয়ে রাখতে ব্যগ্র, কবির দৃষ্টি সে দিকে তীক্ষ্ণ ; উটপাখীর অসহায় বোকামির প্রতীকে মধ্যবিত্তের সেই অসহনীয় দশার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন –

কোথায় লুকাবে ? ধু ধু করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।

অবক্ষয়ী বন্ধ্যাজীবনকে আঁকতেই তিনি এই কবিতায় মরুভূমির পটভূমি তৈরি করেছেন।

'ক্রন্দসী' গ্রন্থের 'সন্ধান' কবিতায় দেখি কবি যখন নিজের চৈতন্যে আশ্রিত হতে চাইছেন, নিজের বোধিকে অন্বেষণ করতে ব্যগ্র, তখন তাকে তিনি বৃক্ষের প্রতীকে বর্ণনা করেছেন—

অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাগে
বিকশিত আশুক্লান্ত নির্বিশেষ ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে॥

'জেসন' কবিতায় কবি বলছেন—'আমগ্ন তরণী ছেড়ে, ঝাঁপাতে পারি না তবু জলে।' সনাতনী সমাজ-ব্যবস্থা এবং চিরাচরিত জীবনধর্ম ছেড়ে অজানিত নতুনের প্রতি চট করে আসক্তি দেখাতে মানুষ পারে না—সে ইঙ্গিত কি আছে ? সনাতনী আদর্শের ঘুণধরা অবস্থা হলেও তাতেই আশ্রিত হয় মানুষ।

'মৃত্যু' কবিতাটিও প্রতীক চেতনার চিহ্ন বহন করে। মৃত্যু নির্বাণের নামান্তর বলে উল্লেখ করেও কবির মনে হয়েছে মানুষ সংসারে ইন্দ্রিয়াসক্তিরই পরিচয় দেয় বেশী। কণ্টকিত শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর ঘনান্ধকারে নির্বাণ আছে জেনেও স্বপ্নবহ মলয় বাতাসে মানুষের চিত্তে মন্দারের অক্ষয় পরাগের স্পর্শ জাগে। সংসারের সৌন্দর্যে সে লুব্ধ হয় মুগ্ধ হয়। এই কবিতার এক জায়গায় আছে—

মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ত্ব কল্পনামাত্র। বল্মীকের সাম্যময় স্তূপে
নির্লিপ্তি, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।
প্রেতগণ
জটলা পাকায় হেথা বৈতরণীতীরে ;
জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিড়ে ;
পরপারে কপিসেনা করে সেতুবন্ধের সূচনা॥

এই প্রেত কারা ? জীবনের যা'কিছু অতীত, তাকেই প্রেতের প্রতীকে বর্ণনা করা হয়েছে, আর অতীত থেকে ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন, তাই বুঝি জন্মজন্মান্তরের খেয়া, যে খেয়া বৈতরণীতে পারাপার করে, অতীত ও ভবিষ্যৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রতীকতায়ও দুরূহতা রয়েছে—অন্তত 'দশমী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে ; এখানে কবি নিজেকে পরিণত প্রৌঢ় কবি হিসাবে পরিচিত করিয়েছেন এর প্রজ্ঞা পরিশীলিত মন ও মননের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। তিনি এর আগে 'ফাল্গুনী' বলতে ফাল্গুন মাসকেন্দ্রিক ঋতু বসন্তকালকে বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু 'প্রতীক্ষা' কবিতায় যখন

কবি লিখলেন—

জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে—

—তখন নিশ্চয়ই বসন্তকালকে সূচিত করার জন্যে কবি ফাল্গুনীর প্রতীক আরোপ করেন নি ; আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে বার্ধক্যে উপনীত ; তাঁর যৌবন কবে চলে গেছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারী বসন্ত সমাগমের সঙ্গে তাঁর যৌবন কোনও দিন আর ফিরবে না—সে কথা কবি জানেন, এই 'ফাল্গুনী' বসন্তের প্রতীক চিহ্ন বহন করে আনে নি, এনেছে ফাল্গুনে যে যৌবন উন্মন হয়, পলাশের অঞ্জলিতে মনে ছলনা-লীলা জাগে—সেই ফাল্গুনী আর জাগবে না।

এই রকম একটি কথার ব্যবহারে একটা বড় ছবি বা পটভূমির ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন—তাঁর প্রতীক-শব্দ ব্যবহারের এই কৃতিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। 'ত্রিশঙ্কু' শব্দের মাধ্যমে তিনি অসহায় আশ্রয়হীন ট্র্যাজিক মানুষের ছবি এঁকেছেন। বিখ্যাত 'যযাতি' কবিতায় তিনি যে দ্বৈপায়নের কথা বলেছেন—তার দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই দ্বীপে জাত কোনো নব যুগের ব্যাসদেবকে নয়, বর্তমান বিরাট বিশ্বের সামাজিক সাম্রাজ্য থেকে অনন্বিত এক নিঃসঙ্গ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন।

নঞর্থক জীবনে চৈতন্যকে কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন নি ; জীবন শূন্য ; নিখিল নাস্তির বিরূপতায় জীবন রুক্ষ, ধূসর, কিন্তু যে চৈতন্য জীবনকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়—তা কিন্তু এমন নেতিবাচক নয়, সে সর্বদা জীবনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, এই চৈতন্যকে তিনি বৃক্ষের প্রতীকতায় বর্ণনা করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর মগ্নতরীর মাধ্যমে, তাঁর তরণী হয় মগ্ন হচ্ছে, না হয় ভগ্ন হয়ে গেছে, হয় নষ্ট না হয় ভ্রষ্ট ; তাই তাঁর তরীর হালভাঙা।

তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত মনের ছায়া ধরা পড়েছে রিক্ত ঋতু হেমন্তের পরি-প্রেক্ষিতে ; শূন্য এবং বন্ধ্যাজীবনের নিষ্ফলতার চেহারা তিনি প্রকৃতির

শীর্ণতার প্রতীকতায় ব্যক্ত করেছেন, এবং এই সব প্রতীক ব্যবহার খুবই সরল ভাবে দ্যোতিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী চেতনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ কবি চারিদিকে যে অকল্যাণ দেখেছেন—তাও তিনি কাল-পেঁচা বাদুড় শৃগালের উন্মত্ত উল্লাসের রূপকতার আড়ালে ব্যক্ত করে-ছেন—যেগুলি বুঝতে কারুর অসুবিধা হয় না।

অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ

কবিতার অনুবাদ বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। এক ভাষার বক্তব্য, বিন্যাস, রূপকল্প, কবির সংবেদন, একটি সমগ্র জাতির প্রবচন, সংস্কৃতি-প্রাণতা সব কিছুই কবিতার সূক্ষ্ম শরীরে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে, তাকে অন্য ভাষার পাঠকের কাছে মূলকবির মর্জি, মেজাজ এবং মনন অক্ষত রেখে পরিবেশন করা সম্ভব কিনা সে প্রশ্নে না গিয়ে বলতে পারি—কাজটা খুবই দুরূহ। সুধীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতা নিয়ে তাঁর ভক্তেরা মাঝে মাঝে হৈ চৈ করেন, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ নিজে এবিষয়ে যথেষ্ট কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ প্রকাশ করে গেছেন। ফরাসী কবিতার বঙ্গানু-বাদকে তিনি বাজে পরিশ্রম বলে ভেবেছেন, মালার্মের বিখ্যাত কবিতা 'ফনের দিবাস্বপ্ন' প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি এখানে স্মরণীয়। মালার্মে যে মর্জির এবং বৈশিষ্ট্যের কবি, তাঁর কাব্যে তাঁর মানসভঙ্গী যেমন ভাবে বিধৃত, বাংলায় সেই মর্জি ফোটানো অসম্ভব। সুধীন্দ্রনাথ নিজেও তা জানতেন, 'ফনের দিবাস্বপ্নে' যে সব চিত্রকল্প আছে—তা বাংলায় অনু-বাদ করা একেবারেই অসম্ভব। এই সত্য সুধীন্দ্রনাথের অনুভববেদ্য ছিল ; তাই অনুবাদকর্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই রায় দিয়েছেন যে অনুবাদ কর্ম নিতান্তই পণ্ডশ্রমের ব্যাপার।

সুধীন্দ্রনাথ যে সব কবিতার অনুবাদ করেছেন—তাদের অনেকগুলির মূল কবিতা পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তাদের কয়েকটির ইংরাজী অনুবাদ পড়েছি, সেখানেই মূলের অনেকখানি ঝরে গেছে, সুধীন্দ্র-নাথের অনুবাদের গুণাগুণ বিচার তাই আমার পক্ষে কিছু ধৃষ্টতার কাজ হবে ভেবে ক্ষান্ত হচ্ছি।

তবে মূল ইংরাজী কবিতাগুলির অনুবাদ প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলতে পারি। সেক্ষপীয়রের সনেটের অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ সেক্ষপীয়রের

মেজাজটি বাংলায় তুলে ধরেন নি; অনেক ক্ষেত্রেই মূল কবিতার লক্ষ্য এক, অনূদিত কবিতার বক্তব্য অন্য—এমনও হয়েছে। অনূদিত সম্পদকে স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবে নূতন সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যেতেও সুধীন্দ্রনাথ দ্বিধা করেন নি। সেক্ষপীয়রের সনেটে যেখানে ধ্বনি ব্যঞ্জনা নেই, ভাষান্তরিত করার সময়ে তাঁর স্বভাবসুলভ শব্দ প্রীতির আধিক্যে এবং পরিমার্জনার দৌলতে বহু অযাচিত শব্দ এসে ভিড়েছে। সেক্ষপীয়রের ১৩০ নম্বর সনেটের অনুবাদটি (যেটি 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্থে 'মৃন্ময়ী' নামে স্থান পেয়েছে) লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

সুধীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ অনুবাদকে যথার্থ মূলানুগ বলে বর্ণনা করা চলে না, মূল কবিতার ভাব নিয়ে তিনি কাব্যময় পরিবেশ রচনা করার কাজ করেছেন, নিজের ভাষা দিয়ে কবিতার প্রাণচাঞ্চল্য এনেছেন। সেক্ষপীয়রের সনেটের পুরুষ প্রেমিককে সুধীন্দ্রনাথ প্রেয়সী করে গড়তে দ্বিধা করেন নি, সেক্ষপীয়রের ১৩০ নম্বর সনেটের অনুবাদ লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

ফরাসী বা জার্মান কবিতার অনুবাদেও শোনা যায় সুধীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড রকম স্বাধীনতা নিয়েছেন। বিদেশী নারী চরিত্রকে তিনি ভারতীয় নারী রূপে অঙ্কিত করেছেন—তাই জার্মান কবিতার অনুবাদে আমরা পাই আর্যসত্য, শঙ্করাচার্য, সীতা, বৃন্দাবন, পঞ্চসতী, শকুন্তলা, কালিদাস, কোনারকের সুন্দরী, পলাতক, ফাল্গুনী, বিশ্বমহাভারতীর অন্তর্গত গীতা—এই সবের উল্লেখে বোঝা যায় তিনি দেশীয় পরিবেশে বিদেশী কবির ভাবটুকুকে উপস্থাপন করেছেন। ক্রীসমাসের পরিবর্তে তিনি জন্মাষ্টমীর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ আক্ষরিক তর্জমার বিরোধী ছিলেন, এবং ছন্দেরও যথাযথ অনুকরণকে তিনি পছন্দ করতেন না—তাই আক্ষরিক অনুবাদকে তিনি তাঁর 'অনর্থের বিড়ম্বনা' বলে ভাবতেন; এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন—"ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ-সত্যে পৌঁছতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপ

রীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলুম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিষেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চ পার্বিকের একান্তর ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয় : আমাদের কানে ভালো না লাগলে, তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক ; এবং চিত্র-কল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরানী রসাভাস ঘটায়, অভীষ্ট আবেগ জাগিয়ে দর্শকদের সাধুবাদ পায় না।"

সুধীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে এক কবির অভিপ্রায় যদি ভাবচ্ছবির তারতম্যে না বদলায়, তবে সেখানে পরিচিত প্রতীকে তার অনুবাদ করা উচিত। অনুবাদকর্মের দায়িত্ব নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ এই মত পোষণ করে গেছেন। সাময়িক ভালোলাগা থেকে তিনি অনুবাদকর্মে প্রবর্তনা পেয়েছিলেন, পরে তিনি অনুবাদে কিছু মনোযোগ দিয়ে থাকবেন— এবং তখনই তাঁর উল্লিখিত মত তৈরি হয়ে থাকবে, এবং তদনুযায়ী তিনি অনূদিত কবিতাবলীর কিছু সংস্কার কার্যও করেছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'কবিতা' পত্রিকার 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতি সংখ্যায়'—(আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭) দিব্যেন্দু পালিতের 'আমাদের মাষ্টার মশাই সুধীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি স্মৃতি-আলেখ্যের কথা। ঐ স্মৃতিচারণায় দিব্যেন্দুবাবু সুধীন্দ্রনাথের কিছু উক্তি ঊর্ধ্বকমার মাধ্যমে তুলে দিয়েছেন, আমি শুধু অনুবাদ প্রসঙ্গে উক্ত সুধীন্দ্রনাথের কথা কটি তুলে দিচ্ছি—এ বিষয়ের কোনো দায়দায়িত্ব আমার নয়। দিব্যেন্দুবাবু সুধীন্দ্রনাথকে 'লিখছেন না কেন' বলে যে প্রশ্ন করেছিলেন —তার উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ বললেন—"বুদ্ধদেবের 'কবিতার' কত অনুবাদ করলুম। অবশ্য তাতে বেশি অসুবিধে হয় নি। আমার স্ত্রী অনুবাদ ক'রে রেখেছিলেন, আমি শুধু সেগুলোকে ছন্দে বেঁধেছি।"

(কবিতা, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১-২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৭)

শাব্দিক সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের প্রধান অভিযোগ হলো যে তিনি দুর্বোধ্য কবি। তাঁর রচনা সহজ-সুখপাঠ্য নয়, পাঠকের মনীষা তথা সদিচ্ছা না থাকলে তাঁর কাব্যের রস উপলব্ধি করা দুরূহ। শব্দ ব্যবহারেও সুধীন্দ্রনাথের ছুৎমার্গ এমনই যে সহজ ব্যবহারের দশায় পড়ে যে শব্দ শিথিল—তার ছোঁয়া তিনি সর্বদা এড়িয়ে গেছেন, ফলে সহজ কথার ধার তিনি ধারেন নি। এ অভিযোগের খবর স্বয়ং কবিরও অজানা নয়। তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি করে গেছেন—'বন্ধু মহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিষয়ে সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরের অভাব বশতই আমি যে কালে গুরুজনদের ভর্ৎসনা-ভাজন, তখন ওই অহৈতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।'

উপরের উদ্ধৃতিটুকু হলো 'স্বগত' গ্রন্থের ভূমিকার শুরুর কয়েকটি বাক্য মাত্র। এই অংশ ছাড়া অন্যত্রও সুধীন্দ্রনাথ নিজের কবিতার দুরূহতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, ১৯৪৬ সালে ১৫ই এপ্রিল তারিখে বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত এক পত্রে তিনি নিজের লেখার দুরূহতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'যে লেখা সাধারণ-বোধ্য নয়, তার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু লিখতে গেলেই আমি প্রচণ্ড বাধা অনুভব করি, এবং সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে আমার সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে যায়, দুরূহতা অতিক্রম আর সাধ্যে কুলায় না। সেই-জন্যেই আমি এত কম লিখি, এবং লেখা শেষ ক'রে সাধারণ লেখক যে আরাম পান, তা আমার কপালে জোটে না। তবু চেষ্টায় আমি বিমুখ

নই, এবং ইতিমধ্যে প্রবর্তনা যদি একেবারে না ফুরোয়, তাহলে কোনো একদিন হয়তো সরল রচনা আমার কলম দিয়েও বেরোবে।'

কিন্তু মৃত্যু ব্যাধের মতো সারস্বত মন্দির থেকে কবিকে অকালে শিকার করে নিয়ে গেছে, ফলে সুধীন্দ্রনাথের সরল সহজবোধ্য লেখা পাবার সৌভাগ্য থেকে আমরা চিরকালের মতো বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তাই কবির দুরূহ কাব্য সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করতেই হবে—যদি কবিকে আমরা বুঝতে চাই।

শব্দশিল্পী হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাই তাঁর কাব্যবিচারে তাঁর শব্দ ব্যবহারের কৌশল আলোচনাযোগ্য। আমি প্রথমে তাঁর ব্যবহৃত দুরূহ শব্দ সম্পর্কে দু একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গের সূত্রপাত করি।

সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত দুরূহ শব্দগুলির প্রায় সবই তৎসম গোত্রের ; দু চারটে শব্দ—যা তিনি তৈরি করেছেন—তাও সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় শাসিত, উটকো বা খামখেয়ালজাত নয়। কিছু যে অভিধান বহির্ভূত শব্দ বা প্রচণ্ড প্রয়াস ব্যয় করেও অর্থ উদ্ধার করা যায় না—এমন শব্দ নেই—তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। পরে আমি এই জাতীয় দু চারটি শব্দের উল্লেখ করেছি।

কবিকে কাব্যের মধ্যেই খোঁজা উচিত, তবু কবির জীবনচরিতের দু একটি ঘটনা জানার একটু দরকার হয়, অন্তত কবির মন কিভাবে তৈরি হয়েছে, তাঁর মেধা ও মনীষা কোন্ চিন্তালোকের স্তর বেয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে—তা জেনে নিলে কবির মানস-প্রবণতার সুরটি আপনা থেকেই পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রুলিং দিয়েছেন—কবিকে জানতে হলে কাব্যই পড়তে হয়, কবিকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। কথাটা সত্য, আংশিক ভাবে পাঠকের পক্ষে পালনীয়ও বটে, তবু রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিবিধ পুঙ্খ এবং অনুপুঙ্খ বিষয়গুলি, তাঁর অধ্যাত্মমানস এবং প্রেম-চেতনা, লোক-নিরুক্তির সংবেদন প্রভৃতির মৌল সুর কি সহজে ধরার পক্ষে সুবিধাজনক হয় না?

সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই। সুধীন্দ্র-মানসের স্বাতন্ত্র্যে যে প্রজ্ঞাগভীর চেতনার বিশিষ্টতা—সেটির স্বরূপ জানলে তাঁর কবিতা পড়ার পক্ষে পাঠকের একটু সুবিধা হতে পারে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সৌকুমার্য অপেক্ষা যুক্তি-প্রাধান্য ঈষৎ প্রকট—এই সত্যটা অনেকেই এড়িয়ে যান। এতে সুধীন্দ্রনাথকে বোঝবার সুবিধে বলেই আমার মনে হয়। তিনি যা নন, তাই বলে তাঁকে ঘোষিত করলে তাঁর গৌরব বাড়বে বলে মনে হয় না, পরন্তু তাঁর কাব্য সম্পর্কে আমাদেরও মনে একটা ধোঁকা থেকে যাবে। শব্দের ব্যাপারেও দেখি সুধীন্দ্রনাথের প্রশংসা এমন তুঙ্গী—অন্তত কয়েকজনের কাছে, সেখানে তর্কের খাতিরে যদি সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত দু একটি শব্দের অর্থ বা ব্যঞ্জনার খেই জানতে চাওয়া হয়—তখন ভৎর্সনাপাত্র হতে হয়, আমাকে দু একটি ক্ষেত্রে হতেও হয়েছে. কবিতা—কবিতা, তার আবার অর্থ বা ব্যঞ্জনা খোঁজা কেন ?

সুধীন্দ্রনাথ ধনী অভিজাত পরিবারের সন্তান, আপামর সর্বসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তাঁর ছিল না ; বাল্যকাল থেকেই তাঁকে ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। তাঁর পিতা বিখ্যাত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যদিও এঁরা চোরবাগানের দত্ত পরিবার, কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতা হাতী-বাগানে বাড়ি করে চলে আসেন এবং এঁদের হাতীবাগানের বাসিন্দা বলেই সকলে জানেন।

হীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের বেদান্ত-শাখার একজন ব্যাখ্যাতা বললে খুব কমই বলা হয়, প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ বৈদান্তিক পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি নিজে তাঁর পুত্রদের লেখা-পড়ার দিকে নজর দিতেন।

ভারতীয় আদর্শে ছেলেরা মানুষ হোক—এমন গোড়ামি তাঁর ছিল না, কিন্তু সৎশিক্ষা পাক—এই চিন্তা থেকেই তিনি ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যাতে পুত্রদের মন আকৃষ্ট

হয়—এজন্যে হীরেন্দ্রনাথ পুত্রদের বিশেষভাবে নজর দিতেন, তাই তিনি তাদের বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেবার দিকে জোর দিয়েছিলেন, এবং বাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষার বনিয়াদ তৈরি হবার পর সুধীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুজ হরীন্দ্রনাথকে কাশীতে পাঠানো হলো—লেখাপড়া শেখার জন্য। (সংস্কৃত শিক্ষা যাতে সুসম্পূর্ণ হয়—সেই উদ্দেশ্যেই যে কাশীতে সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাইকে পাঠানো হলো—এমন মনে করবার কারণ ছাড়া আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা ভালো যে বাল্যকাল থেকেই এই দুটি বালক তাঁদের ছোটকাকা অমরেন্দ্র দত্তের ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিষ্য ছিলেন এবং বিখ্যাত নট হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের মদ্যপ এবং পরে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এঁর প্রভাব থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেও বটে এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্যেও বটে সুধীন্দ্রনাথ এবং হরীন্দ্রনাথকে কাশীধামে তাঁদের জ্যাঠামশাই ধীরেন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হলো।)

আনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত কাশীর থিওসফিক্যাল স্কুলে সুধীন্দ্রনাথ ও হরীন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দেওয়া হলো, তখন সুধীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বছর। তিন বছর সেখানে পড়ে সংস্কৃত ভাষায় সুধীন্দ্রনাথ দক্ষতা অর্জন করেন এবং পরে কলকাতায় এসে বাড়িতে হরিচরণ কাব্যতীর্থের কাছে বেশ কিছুকাল সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন। হীরেন্দ্রনাথ নিজেও অবকাশ সময়ে ছেলেকে সংস্কৃত সাহিত্য পড়াতেন, তিনি পণ্ডিত মশাইকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যাপনাকালে যেন সুধীন্দ্রনাথের কাছে তিনি কোনো অশ্লীল তথা আদিরসাত্মক কোনো পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বাদ না দেন, সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের স্বাদ ও পরিচয় যেন অধীতী ছাত্র পায়। এইভাবে সুধীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে জ্ঞানলাভ হয়। এর ফলে তাঁর তৎসম শব্দ

সম্পর্কে নিজস্ব একটি পরিজ্ঞান তৈরি হয়ে যায়, এবং সেই পরিজ্ঞানের দৌলতে তিনি নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমতো বহু শব্দ তৈরি করে নিয়েছেন।

বহিরঙ্গের দিক থেকে বাঙ্ নির্মিতির আর এক অভিজ্ঞান কাব্যের কায়া। শব্দের গাঁথুনিতেই কাব্যের সাতমহলা। সুতরাং কবিদের তাই শব্দ নিয়েই যতেক যত্ন আর ভাবনা।

শব্দ চিরদিন ধরে যদি একই অর্থ প্রকাশ করে, তবে তার দাম কমে যায়—এই সহজ সত্য আর সব বড় কবির মতো সুধীন্দ্রনাথেরও মগজে ছিল ; তিনি জানতেন শব্দাবলীকে নতুন অনুভবমালা রচনার কাজে না লাগালে কাব্যের মুক্তি ঘটবে না, তাই চিরাচরিত শব্দগুলি—যাদের মধ্যে নবায়মান ব্যঞ্জনা আরোপ করা চলে না—সেগুলি তিনি এড়িয়ে চলতেন। কবির উপলব্ধিকে পাঠকের কাছে হাজির করতে হলে পূর্ব-সূরীর দেখানো পথে চললে মাহাত্ম্য অর্জিত হয় না, ঘ্যানর ঘ্যানর করে একই অর্থের বাজনা বাজাতে বাজাতে যে শব্দ মাধুর্য হারিয়েছে —তাকে সরিয়ে সমশ্রেণীর বা স্বজাতির পরিজনকে ডেকে আনলে ক্ষতি নেই, বরং তার কাছ থেকে কাজ পাওয়া যাবে ভালই, পাঠকের হয়তো ঈষৎ অসুবিধা হতে পারে—কিন্তু প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা ঘুচে গেলেই সে আবার সহজ হতে পারবে। শব্দের স্বভাবকে সুধীন্দ্র-নাথ টাকার সঙ্গে তুলনীয় ভেবেছিলেন—'বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাস কেসে।' কবির 'কাব্যের মুক্তি' নিবন্ধটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—'কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্য বর্জনীয়, তবে ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগর পরিক্রমা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।' অর্থাৎ প্রচলিত শব্দের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙেই ওপরে ওঠবার একক মন্ত্র জপতেই হবে, এবং বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী করা বিদেশী শব্দ-লিফ্‌টে চড়া নিষিদ্ধ করতে হবে বলে যে বিধান তা নিশ্চয়ই অমান্য করতে হবে। বেশী ক্ষয়িষ্ণু শব্দের

শুচিবায়ু নিয়ে পাগলামি না দেখিয়ে আবেগকে মুক্তিদানের জন্যে যদি ভিন্নগোষ্ঠীর কাছে শব্দের জন্যে হাত পাততে হয়—তাতে পরোয়া করলে চলবে না, কিংবা শব্দের আদিম ব্যঞ্জনা মুছে যদি তাকে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করতে পারা যায়—তবে সেখানেই কাব্যের সার্থকতা, শব্দার্থের যথার্থ মুক্তি। সুধীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করতেন, তাই শব্দকে তিনি নতুন ব্যঞ্জনায় ভাবগূঢ় করার প্রয়াসে সর্বদা ব্রতী ছিলেন। এ বিষয়ে কবির একটি দামী মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

সুধীন্দ্রনাথ শব্দকে কবিতার মুখ্য উপাদান হিসেবে ভাবতেন, এবং তিনি তাঁর রচনাতে তাই শব্দ নিয়ে বেশীর ভাগ সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাটাতেন। একটি যথার্থ যোগ্য শব্দ যদি প্রেরণাবশে জায়গা মতো না আসে, তিনি খুশী হতে পারতেন না, এবং উপযুক্ত শব্দের সাধনায় তিনি বিভোর হয়ে পড়তেন ; আর যতক্ষণ বা যতদিন না অন্বিষ্ট শব্দটি উদিত হতো—ততক্ষণ বা ততদিন তিনি শান্ত হতে পারতেন না। 'সংবর্ত', গ্রন্থের কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখছেন —'উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে-অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় রয়েছে, এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাসও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদনীন্তন ঘটনাঘটন।'

মনের অভিলষিত উপযুক্ত এবং যোগ্য শব্দটিকে খুঁজে যতক্ষণ না পেতেন—সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে পরিতুষ্ট হতে পারতেন না। তাঁর অধ্যবসায়ী মন কেবলই হাতড়ে মরে, সাধনা করে—দুর্লভ কোন্ মুহূর্তে সিদ্ধিলাভ ঘটাবে, সুচির-ঈপ্সিত শব্দটি সহসা কখন উদিত বা আবির্ভূত হবে। এর জন্যে তিনি শ্রম ও সময় ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি লিখেছেন যে একদিন 'উড়ে চলে গেছে'—এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার

'উড্ডীন' বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় তাঁকে সারা সন্ধ্যা কাটাতে হয়েছে। বিশেষ একটি শব্দের অনুসন্ধানে এই রকম সময় এবং প্রযত্ন ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

'সর্বজন' পদ থেকে সার্বজনীন বা সর্বজনীনকে ব্যবহার না করে তিনি লিখলেন 'সার্বজন্য'। 'সস্নেহ প্রশ্রয়'-কে তিনি কিছুতেই এই চেহারায় উপস্থিত করতেন না—তিনি লিখলেন—'সপ্রশ্রয় স্নেহ'। অর্থের দিক থেকে সামান্যই হেরফের ঘটলো, কিন্তু তাৎপর্যে বা ব্যঞ্জনায় গুরু কেন কোনো লঘু প্রভেদও লক্ষিত হলো না। সুধীন্দ্রনাথ 'হালকা' না বলে বললেন 'অ-গুরু' ('নৌকা ডুবি' কবিতাটি দ্রষ্টব্য। 'শয্যায়' না লিখে লিখলেন 'শয়নী' ('কণ্টকিত শয়নীয়ে শুয়ে'—'মৃত্যু' কবিতা দ্রষ্টব্য)। 'বিকচ' শব্দের সাধারণ অর্থ প্রফুল্ল বা বিকশিত, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ 'বিগত কচ অর্থাৎ চুল যার' এই অর্থে 'বিকচ' শব্দ ব্যবহার করেছেন ('চপলা' কবিতাটি দ্রষ্টব্য)। ঐ 'চপলা' কবিতাতেই তিনি বিদেহী অবস্থা বোঝাবার জন্যে লিখলেন—'অকায় আবির্ভাবে'। আর 'বৈদেহী' শব্দের দ্বারা সীতাকে না বুঝিয়ে দেহহীন অবস্থায় উদ্ভূতা' বোঝাতে চাইলেন 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থের 'হৈমন্তী' কবিতায়। 'ব্যক্তিক' বা 'ব্যক্তিগত' (individual) অর্থ বোঝাবার জন্যে তিনি ব্যবহার করেছেন 'প্রাতিস্বিক।' 'বিহ্বল' (confused) অর্থ বোঝাতে তাঁকে লিখতে হয়েছে 'বিপ্রলাপিত'। 'মুহ্যমান' না বলে বলেছেন 'মোহ্যমান' আসক্ত না বলে তিনি 'সংসক্ত' বললেন। 'ধরা'র সঙ্গে মিল দেবার জন্যে তিনি সুন্দরের স্ত্রীলিঙ্গে লিখলেন 'সুন্দরা'।

সুধীন্দ্রনাথ অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন—'হারাবে না পবিত্রতা নৈমিত্তিক ক্রিমির প্ররোহে।' প্রকৃতি-প্রত্যয় অনুসারে 'প্ররোহ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'বৃক্ষের ঝুরি', কিন্তু 'অঙ্কুর' হিসেবে এর আর একটা বাড়তি অর্থ করে নেওয়া হয়েছে। 'প্ররোহে' সাধুগদ্যের সমাজেও অচলিত, হয়তো এই কারণেই সুধীন্দ্রনাথের এই শব্দটির প্রতি মোহ। 'নক্ষত্রের ঋষ্টিরূপে জীবঘন ধরিত্রীর শিরে' পঙ্‌ক্তিতে 'ঋষ্টি' শব্দটি একান্ত অনি-

বার্য ? 'অশুভ গ্রহদোষ' বোঝাতে তানপ্রধান ছন্দের দু মাত্রার প্রয়োজনে 'ঋষ্টি' ছাড়া অন্য গভীর শব্দ মেলা ভার। কিন্তু 'উদ্বেজিত গৃহ মাঝে' বলার মধ্যে 'উদ্বেজিত' বিশেষণটির সহজতর সুপ্রচল প্রতিশব্দ অনেক পাওয়া যায় না কি ?

সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়/তোমারই তনুর মদিরা ভরা। 'অরাল' শব্দটির অর্থোদ্ধার না করলেও পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের কাব্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করতে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না, তবু খুঁটিয়ে পড়া যাঁদের অভ্যাস—তাঁরা 'অরাল' শব্দের অর্থ না জেনে ছাড়বেন না। 'অরাল' শব্দটি এখানে বক্র বা কুঞ্চিত অর্থে বসতে পারে, কুটিল অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে। কুটিল তিনমাত্রার ; ধ্বনির দিক থেকে কুটিলের ব্যবহার সহনীয়, কিন্তু পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়—কবিত্ব আছে বেশী। প্রথম শব্দদ্বয়ের 'ক' ধ্বনির সৌন্দর্য পরম্পরিতভাবে 'ল'-এর দ্বিত্বে যতটা ধরা পড়েছে, কুটিলের 'ল'-য়ে ততটা ধরা পড়তো না, কারণ এই পঙ্‌ক্তির চারটে শব্দেই আ-কারের প্রাসিত আমেজ বিশেষ লক্ষণীয়, 'কুটিল' শব্দে আকারের অনুপস্থিতিতে এই রসের আস্বাদ মাটি হতো। এই রকম 'বিকলতা' কবিতায় অধরের অঞ্চিত কার্মুকে' বলার মধ্যেও অধর এবং অঞ্চিত—পদদ্বয়ের অনুপ্রাস বেশী আস্বাদ্য হয়েছে। যদিও কবিতাটির অর্থ বোঝা দুরূহ নয়, তবু 'অধরের অঞ্চিত কার্মুকে বিরল গুঞ্জন টংকারিছে' বাক্যে অঞ্চিতের অর্থ বক্রীকৃত অর্থাৎ যা বাঁকানো হয়েছে, আর 'কার্মুকের' ধনুক বা ইন্দ্রধনু ধরে নিলেই কবিতাটিতে একটি মধুর রূপকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

নিচের পঙ্‌ক্তি ক'টি দেখা যাক—

> তবে আজ কিসের আশায়
> অজ্ঞাত শিবিরদ্বারে এলে পুনরায়
> অনুযাত্র সঙ্গে ক'রে রুদ্র রোষে আস্ফালি কুলিশ ?

'অনুযাত্র' অর্থ না জানলে এই কবিতার পূর্ণ রসোপলব্ধি ঘটবে কি ? এখানে 'অনুগামী' বললে কোনো ক্ষতি হতো না, কিন্তু কবির মন দুরূহ

অপ্রচলিত শব্দের প্রতি মমতাসম্পন্ন বলেই 'অনুগামী'র অপ্রচলিত প্রতিশব্দ 'অনুযাত্র' ব্যবহার করেছেন। তেমনি 'তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে' বাক্যে 'উদীর্ণ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রবল' ব্যবহারে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। 'বৃদ্ধ শার্দূলের পাছে তরক্ষুর মতো/ব্যক্ত ব্যর্থতারে ব্যঙ্গ করে বাচাল চিৎকারে'—পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে 'বাচাল চিৎকারে' যেমন পাঠকের শ্রবণ ও মননে রুচিকর 'তরক্ষু' কখনোই কারুর কাছে প্রেয়তার আশীর্বাদ নিয়ে আসে না ; 'তরক্ষু'-র বদলে নেকড়ে বা হায়েনা-র মতো বললে কবিতার জাত যেত না, কিন্তু সুধীন্দ্রীয় বিন্যাসের ঘাটতি হতো। 'কার আহ্বান নিবিদ ভাষায় ভণে' বলার মধ্যে 'নিবিদ' শব্দটির মাহাত্ম্য স্বীকার না করে উপায় নেই, দেবতা সম্পর্কিত প্রাচীন যে সব বাক্য, তৎসম্পর্কীয় যা-কিছু, তা সবই নিবিদ, ছোট্ট এই পদটিকে বিশেষণ হিসেবে ভাষার পূর্বে বসিয়ে কবি গাঢ় ঘন পিনদ্ধ রূপদান করেছেন কাব্য-শরীরে। এই রকম 'প্রপন্ন অজ্ঞাতবাস' বলতে আমরা অভ্যস্ত নই, কিংবা দুষ্প্রাপ্য বা দুর্লভ অর্থে 'দুরাপে'র প্রয়োগ আমাদের অনেকেরই জানা নেই, কিন্তু একবার জানা হয়ে গেলে একটা অভাবিতপূর্ব চমক জাগে। যেখানে এই রকম আচমকা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, সেখানেও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে কবি নিজস্বতার পরিচয় বহাল রেখেছেন। নিচে 'বাৎসরিক' কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি লক্ষ্য করা যাক—

> আবার, সজনী, শ্রাবণ রজনী
> এসেছে ঘুরে ;
> আবার দুরাশা বাসনা তিয়াসা
> গমকে, চমকে মেঘের উরে।

'উরে' শব্দটি আদৌ অপ্রচলিত নয়, তবু 'উরে' শব্দের বদলে 'বুকে' ব্যবহৃত হলে গমকে, চমকে শব্দদ্বয়ে 'কে' আছে, সুতরাং 'বুকে, একে-বারে অকাব্যিক হতোনা, কিন্তু 'ঘুরে' পদের অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োজনে 'উরে' বসেছে।

তা বলে 'অনাহূত' কবিতায়—

সন্তরি শোকের সিন্ধু অশ্রুধৌত ঋজু অনলীক
পবিত্র নিষ্কাম

পঙ্‌ক্তিতে 'অনলীক' শব্দটি না লিখলেও চলতো। 'প্রতর্ক' কবিতায় 'উপজ্ঞা গভীর' পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠা সত্যিই দুরূহ। 'উপদেশ ছাড়া যে জ্ঞান' তাই হলো 'উপজ্ঞা' আর 'অলীক যা নয়'—তাই 'অনলীক'। এই সব শব্দের কণ্টক-বেড়া টপকে তাঁর কাব্যোদ্যানে প্রবেশ করতে অনেক পাঠকেরই অনাহা জাগবে—এতে কিছু অস্বাভাবিকত্ব নেই। পথ চলতে যদি পায়ে কাঁটা ফোটে, তবে দৃশ্যের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যোপভোগের আনন্দ অবাধ হয় না। কিন্তু একবার যদি ভেতরে ঢোকা যায় সদর চৌকাঠ ডিঙিয়ে—বাগানের পুষ্পিত সৌন্দর্যে পাঠক মুগ্ধ না হয়ে পারবে না, প্রবেশেচ্ছুর অধ্যবসায়ের পুরস্কার লাভে বিলম্ব ঘটবে না। এই জন্যই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন—"সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস-সাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন; তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হলো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পঙ্‌ক্তিসমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার এবং শব্দপ্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না করলে তিনি হয়তো প্রাঞ্জলতার উদাহরণ বলেই গণ্য হতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে তাঁর কবিতা হতো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ, তাঁর চরিত্রই প্রকাশ পেতো না। আর এই দুরূহতা নিয়ে আপত্তি—পঁচিশ বছর আগেকার তুলনায়—এখন অনেক মৃদু হওয়া উচিত, কেননা ইতি-

মধ্যে তাঁর প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক ও পাঠক সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে; অল্প-বয়সীরা হয়তো জানেনও না যে 'অন্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য,' 'প্রমা', 'প্রতিভাস', 'অবৈকল্য', 'ব্যক্তি স্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়', 'কলা-কৈবল্য' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ –যা তাঁরা হয়তো কিছুটা যথেচ্ছ-ভাবেই ব্যবহার করছেন—এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে, এমন কি 'ক্লাসিকাল' অর্থে 'ধ্রুপদী' শব্দটি তাঁরই উদ্ভাবনা।"

ইংরাজী শব্দের ব্যবহার না করে সুধীন্দ্রনাথ বাংলায় শ্রুতিসুখ বহু শব্দ রচনা করেছেন, যেমন—প্রাতিস্বিক (individual), আশুচেতন (sensible), আশুবেদন (sensitive) প্রভৃতি। এর ফলে অবশ্যই ভাষার শব্দ-দৈন্যের লাঘব ঘটেছে অথচ বক্তব্যে এক চুলও লঘুতা আসে নি। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বলেই তিনি তৎসম শব্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন বেশী।

এই জাতীয় কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শৈবালিত' স্তব্ধ হ্রদ, 'আরণ্যিক' আমার যৌবন; 'নিষ্পুণ্য' প্রত্যাখ্যান; তনিমার 'সলীল' ভঙ্গিতে; 'বৈফল্য'; 'তুষারিত' বাতায়নে; 'হিংসালু' শিবি; 'অঙ্গারিত' সৌরতেজসম; 'তপন্ত' তপন; সার্বজন্য রসের 'নিপান', 'বিষায়িত' কুটীরের ভিড়ে—প্রভৃতি। নতুন ব্যঞ্জনা তথা প্রচ্ছন্ন একটা মহিমা আরোপের চেষ্টা যে না হয়েছে—তা নয়, কিন্তু কোথাও ব্যাকরণের নিয়মকে দুমড়ে মুচড়ে 'নতুন কিছু করার মূঢ়তায়' তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি। আজকাল রুচিবান্, সংস্কৃতিবান্ (সুতরাং বুদ্ধিবান্), দুষ্কৃতকারী প্রভৃতি শব্দ চালানোর হাস্যকর মূঢ় চেষ্টার তিনি সামিল হন নি—এ থেকেই বোঝা যায় শব্দ তৈরির ব্যাপারে তাঁর প্রজ্ঞা পরিশীলিত মনে ব্যাকরণ-বোধ কত প্রকট ছিল।

সুধীন্দ্রনাথের শব্দ নির্মাণের একটি কৌশল এই যে তিনি অনেক নঞ-র্থক শব্দ তৈরি করেছেন, ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই তা করেছেন; যেমন—অস্বচ্ছ (স্বচ্ছ নয়), অনলীক (যা অলীক নয়), অকায় (বিদেহী

অবস্থায়), অস্বকীয় (যা নিজের নয়), অস্বক (পরকীয়), অস্থ (অবর্তমান) ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দের দুরূহতা লক্ষণীয়। হাল্কাকে যদি অগুরু বলা হয়, তাহলে অগুরু শব্দের সঙ্গে অন্য যে বিষয়ের সম্পর্ক বেশী—সেই সম্পর্কিত অর্থের প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে মনে পড়বে, পরে 'ন গুরু' অর্থাৎ লঘু—এই অর্থ দ্বিতীয়ত উপলব্ধ হবে। 'অনিকাম'—এই জাতীয় আর একটি শব্দ। নিকাম শব্দের মানে হচ্ছে প্রচুর; সুধীন্দ্রনাথ অপ্রচুর বা অপর্যাপ্ত অর্থে 'অনিকাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।'অনির্বেদ' সম্পর্কে এই একই কথা খাটে। দুরূহতা সৃষ্টির জন্যেই তিনি নঞর্থক শব্দ তৈরি করতেন।

অনেক সময় তিনি তৎসম শব্দকে বাংলার চেহারায় প্রকাশ করেছেন, যেমন—'নিমেষ নিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে'। এখানে 'সরসে' শব্দের দ্বারা 'সরোবরে' বুঝতে হবে। সরস্ শব্দ থেকেই সরঃ বা সরোবর। কিন্তু 'সরস' বাংলায় আর একটি ভীষণ চালু শব্দ, সুধীন্দ্রনাথ তা জেনেও চোখের সরোবর বলে রূপকালঙ্কার রচনায় দ্বিধান্বিত হন নি! এই বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল, শুধু বলিষ্ঠতা নয়, নির্ভীকতাও। নির্ভীকতা কেন বলছি—তার কারণ ঐ কবিতায় আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—'নিরাশা-নিবিড় আয়ুর অন্ত্যপ্রহরে' নৈরাশ্য না বলে নিরাশা লিখলেন—কেন 'নিরাশা-নিবিড়' চলবে না—একে চালাতেই হবে, এই নির্ভীক মনোভাব নিয়েই তিনি শব্দ-ব্যবহারে তৎপর ছিলেন।

খাঁটি ও পরিশুদ্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে তিনি গ্রাম্য শব্দের মিশেল দিতে কার্পণ্য করেন নি, যেমন—

(১) চিত্ত সঞ্চিত অমৃত বিতরি,
করিবে আমারে মরণ জয়ী?
অথবা আবার খামখা খেয়ালে
অন্ধেরে ঘিরে মমতার জালে (চপলা. অর্কেস্ট্রা)

(২) অলীক স্বপন—তুমিই নিপট সত্য
চলচঞ্চলা!—তুমিই পরম শান্তি॥ (অর্কেস্ট্রা, ২নং)

(৩) দক্ষিণে জল—শ্যাম লাবণ্যে মরীয়া মায়া
প্রখর পিপাসা লক্ষ যোজন ব্যেপে। (প্রত্যাবর্তন, সংবর্ত)

(৪) সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই
ঝেড়ে ফেলে বাঁচা (প্রতীক্ষা, দশমী)

(৫) এমন লোকেও যারা সাঁতারের স-টুকু জানে না,
(জেসন, সংবর্ত)

(৬) তাপ্পি দেওয়া ফোতোবাবুর কাঁধে
নিলেম থেকে দাঁওয়ে কেনা ঘরোওয়ানার আসল জামিওয়ার।
(বিরাম, ক্রন্দসী)

শব্দ-ব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথের একটা ওস্তাদি লক্ষ্যণীয়। তিনি শব্দের আভিধানিক অর্থকে সরিয়ে রেখে ব্যঙ্গার্থকে কাজে লাগিয়েছেন।
'শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ, ধ্বনি-বৈচিত্র্য এবং ছন্দের শোভ-নতা'-র জন্যেই কবিকে শব্দ চয়নের দিকে নজর রাখতে হয়। স্বল্প কথায় বেশীটা প্রকাশ করার জন্যেও বটে, আবার ব্যঞ্জনার প্রতীকতায় উপ-লব্ধিকে গাঢ়তা দানের জন্যেও বটে—সুধীন্দ্রনাথ শব্দের আভিধানিক অর্থের আনুগত্য থেকে সরে এলেন, তিনি প্রত্যেকটি শব্দে অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাকে ধরার চেষ্টা করতেন। শব্দ সম্পর্কে তিনি 'ক্রন্দসী' গ্রন্থে 'বাক্য' শীষক কবিতার শেষাংশে বলেছেন—

মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ-অপ্সরী ;
দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয় ;
তোমার অবেদ্য গানে অব্যক্তির সতর্ক প্রহরী
বিমুগ্ধ নিদ্রায় লোটে, মুক্তি পায় অনির্বচনীয়॥
তোমার আকাশবাণী জলে, স্থলে, পর্বতে, কাননে,
আনন্দে, ব্যথায়, রসে, রূপসীর পার্থিব আননে॥

ব্যঙ্গোক্তিকে পূর্ণ মর্যাদা দেবার জন্যে তিনি শব্দকে বস্তুত্ব থেকে সরিয়ে তার স্বভাবগুণের পরিচায়ক হিসেবেও ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন নি, অর্থাৎ বস্তুবাচক শব্দকে বস্তু-অতীত তার গুণটুকুকে প্রকাশকারী হিসেবে

ব্যবহার করেছেন। 'সংবর্ত' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে মনোযোগ দিলেই আমার এই উক্তির উদাহরণ মিলবে, বিশেষ করে 'প্রত্যাবর্তন' কবিতা-টিতে শব্দগুলির চরিত্রে এই ভাব-মাদকতা সবচেয়ে বেশী লক্ষিত হবে। যখন তিনি 'মদির অন্ধকারে' (অনুষঙ্গ, অর্কেস্ট্রা) বলছেন, তখন অন্ধ-কারের ব্যঞ্জনা যেন স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধির বস্তু করে গড়ে তোলা হয়েছে। 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থের শীর্ষনামের ১নং কবিতায় পাই—

রাত্রিশেষের দ্বিধা দুর্বল আলো
উঁকি মারে ওই খোলা জানালার ধারে।

আলোর বিশেষণ 'দ্বিধা দুর্বল' বলায় শেষ রাত্রির বিদায় তৎপর অন্ধ-কারের প্রস্থান তখনো বিলম্বিত, প্রাভাতিক আলোর উন্মেষও ক্ষীণ, দ্বিধা মানুষের শক্তি ও সাহসকে যেমন দুর্বল ও সংশয়াপন্ন করে—সেই রকম আলো অন্ধকারের দ্বৈধ ভাব, একের প্রস্থান ও অন্যের আবির্ভাব—এটি বোঝাবার জন্যেই কবিকে এমন সুন্দরভাবে বিশেষণ যোজনা করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর কাব্যে শব্দ-ব্যবহারের এবম্বিধ কৌশল বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রকাব্যে এই জাতীয় উদাহরণ এত বেশী এবং এমনই সুপরিচিত যে তার আর উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

তাই সুধীন্দ্রনাথ গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডন করে 'রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল হাওয়ায় বেরিয়ে এসে' যে কাব্যচর্চায় আগ্রহী হয়েছিলেন, তা কিন্তু এদিক থেকে বিচার্য নয়। তাঁকে রীতি-প্রকরণে ধ্রুপদী হতে হয়েছে, অন্য কৌশলে অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারে তিনি সতর্ক হয়েছেন এবং প্রতীকদ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে শব্দকে তার অভিধান-প্রচল স্বাভাবিক অর্থের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিতে তিনি এমন প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। শব্দ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশ্বাসকে তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন—তাঁর একাধিক গদ্য রচনায়। তিনি বলেন—'শব্দ-মাত্রেরই দুটো দিক আছে ; একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রস-

প্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে; কাব্যের শব্দ আবেগবাহী। এর থেকে বোঝা যাবে কাব্য কেন অভিজাত সহানুভূতিকে ছেড়ে অন্ত্যজ দরদকে কোল দিয়েছে।' অন্যত্র তিনি বলেছেন—'যে শব্দ কেবল নিরর্থ ধ্বনির সাহায্যে আবেগ জাগায়, কাব্যের চেয়ে মন্ত্রেই তার প্রয়োগ প্রশস্ত। লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য, তবে কাব্যের শব্দ চিরদিনই অভিধানের মুখাপেক্ষী থাকবে। এ-যুক্তির দ্বারা আমি কবিকে শব্দ প্রণয়নের সনাতন অধিকারে বঞ্চিত করতে চাইছি না; শুধু এই-টুকু বলছি যে দুগ্ধপোষ্য শব্দের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শব্দই বেশী কর্মঠ।' এর দ্বারা তিনি নিজের কথারই ভিন্নার্থ প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন বলে মনে হয়, একদা সুপ্রচলিত এবং বহু ব্যবহার জীর্ণ মুদ্রা যাদুঘরে থেকে যেমন প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবান্বিত সাক্ষী হয়ে থাকে, এবং তার কদর বাড়ে, তেমনি পুরানো ব্যবহার-জীর্ণ শব্দকেও পুনরায় ব্যবহার করা উচিত বলে সুধীন্দ্রনাথ ভাবতেন। 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধেই তিনি এই প্রসঙ্গে বিধানও দিয়েছেন—'অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন কমে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে।' অর্থাৎ রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাদ সাধে না। আগে এই ব্যাপারের উদাহরণ দিয়েছি, প্রসঙ্গতঃ আরো দু একটি উদাহরণ মনে পড়ছে বলে দিচ্ছি। 'প্রতি-ধ্বনি'-র বদলে তিনি 'কথার অনুনাদ' বললেন, 'অনুরাদ' অপ্রচলিত, কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থের 'পুনর্জন্ম' কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অকুণ্ঠ' না লিখে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'নিষ্কুণ্ঠ' ('অকৃতজ্ঞ' কবিতা দ্রষ্টব্য), 'ক্রোধহীনে'র বদলে তিনি বসিয়েছেন 'নিষ্ক্রোধ' ('সঞ্চয়' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি)। এই রকম আরো কয়েকটি শব্দ 'প্রস্তরিত পুরাকাহিনী' 'বিচঞ্চল' নারিকেল বন, 'নিলখ চরণ'।

এই উক্তির আলোকে সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দ বিচার করতে হবে।

বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে তিনি চালু এবং অচলিত শব্দকে সমান প্রশ্রয় দান করেছেন। শব্দকে তিনি যে অর্থের সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি দিয়েছেন—তাঁর কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে তিনি বিজয়ী হয়েছেন—এমন বলা যায় না, কিছু কিছু কবিতায় তাঁর কয়েকটি শব্দ যেমন অকাব্যিক হয়েছে, তেমনি শ্রুতিসুখকরও হয় নি। আমি দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রথমে আমি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে কিছু কিছু অভিধান বহির্ভূত শব্দের ব্যবহার দেখেছি, সেরকম দু চারটি শব্দের উল্লেখ করে পরে অকাব্যিক শব্দের উদাহরণ দেব। আমার পক্ষে যে শব্দের অর্থোদ্ঘাটন সম্ভব হয় নি, এবং আমার কানে যার চারুত্ব বাজে নি, তেমন শব্দেরই উল্লেখ করবো, এটি সম্পুর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে আমার তর্ক নেই, অন্যের কানে সুন্দর ঠেকতে পারে, অন্যে অভিধান বহির্ভূত শব্দের অর্থ করতে পারেন—আমি সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবো না।

অভিধান বহির্ভূত বলতে আমি বাংলা অভিধানের কথাই মনে রেখেছি। 'বন্দ্র' কথাটা অভিধানে পাই নি ; সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

বন্দ্র অলি
তালে বেঁধে দিল
সৃষ্টির স্বয়ম্ভূ সামগান। (মহাশ্বেতা, অর্কেস্ট্রা)

আভাসে 'বন্দ্র' কথাটির মানে বোঝা যাচ্ছে, কবিতাটির রসোপলব্ধিতে কিছু বাধার সৃষ্টিও করছে না। কিন্তু শ্রমশীল ছাত্রের পক্ষে 'বন্দ্র' পদের অর্থোদ্ধার ঘটা মুস্কিল।

আরো কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি, মোটা অক্ষরের শব্দগুলি সম্পর্কেই আমার বক্তব্য :—

(১) আমারে যে ডাকে মুক্ত পথে
দীক্ষা দিতে, মোক্ষে নয়, স্বায়ত্ত শাসনে,
তার অপেরণে
অপচারী **দ্রষ্টাই** প্রকট। (সন্ধান, ক্রন্দসী)

(২) দিগ্বেদে ঘটেনি ভুল
যবে চতুঃসীমার সন্ধিতে দিশারীর সান্ধ্য সভা
বাদ-বিতণ্ডায় হয়েছিল বিভক্ত হঠাৎ ? (পথ, সংবর্ত)

(৩) আর মিথ্যা অনুশোচনাতে
অন্তিম অস্থৈর্য মোর চাহিব না করিতে গোপন ॥
(অনমুতপ্ত, উত্তর ফাল্গুনী)

(৪) অমিতির অখণ্ড মণ্ডল
নিরুপাখ্য কী আনন্দে ভরা ! (মৃত্যু, ক্রন্দসী)

(৫) জীবন্ত মরণে
আপনার নিকামত রেখেছি বেষ্টিয়া। (বিস্মরণী, ক্রন্দসী)

(৬) কাঁদে সেদিনের প্রণত প্রতিধ্বনি
প্রতন গিরির গহ্বর কারাগারে ? (জাতিস্মর, ক্রন্দসী)

'প্রতন' কথাটি আরো বহু কবিতায় কবি ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'ক্রন্দসী' গ্রন্থে 'নরক' শীর্ষনামের কবিতায় 'প্রতন পাতালে' ব্যবহৃত হয়েছে, 'উত্তর ফাল্গুনী'র 'ব্যবধান' কবিতাতেও 'প্রতন হৃদয়ে' আছে।

(৭) এপারে, সুচির ধ্রুব তারকার ঝিমিরে,
স্নাত উপবন পাসরিল উৎকণ্ঠা। (অর্কেস্ট্রা, ৬নং)

এই জাতীয় সুপ্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। সুধীন্দ্রনাথ সর্বদাই অপ্রচলিত শব্দের পক্ষপাতী ভক্ত ছিলেন, তাই অনায়াসেই তিনি 'অস্মিতা', 'উল্বণ', 'ক্রমতুর্ণ', 'কুলাল', 'চীর্ণ', 'ঝাবুক', 'নির্বচন', 'নির্জিত', 'নিলখ' প্রভৃতি অচলিত বা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে দ্বিধা করেন নি, এবং এই জাতীয় শব্দ পাঠক যদি না বোঝেন—তবে তার দায়িত্ব কবির নয়, পাঠকের আলস্য—এমন ইঙ্গিতও তিনি করেছেন। পাঠকের বোধ-ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না, (বোধহয় মমতাও ছিল না?) তিনি মনে করতেন কবির মতো পাঠককেও শ্রমসাধ্য অনুশীলনে কাব্য-প্রসাদ পেতে হবে। পূর্বের কথার দ্বিরুক্তি করে আমি আবার বলি পুষ্পিত উদ্যানে বেড়াতে গিয়ে যদি প্রতি পদে কুট-কণ্টক বিদ্ধ হয়—

তবে ফুলের বাহারে বাহবা দেবার মানসিকতা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দরাজির মধ্যে দু একটি শব্দ কেমন যেন কাব্যের দ্যুতি হারিয়ে ফেলেছে—এবার সেই রকম দু একটি উদাহরণ উপস্থিত করি। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখেছি শব্দের রূঢ়তায় এবং কর্কশ পেষণে কাব্যত্ব প্রায় অন্তিম দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। সে জাতীয় শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে ভক্ত স্তাবকের মতো বাহবা দিতে কুণ্ঠা হয়। তিনি সব সময়ই শব্দ-ব্যবহারে গাম্ভীর্য আনায় সচেতন ছিলেন, তাঁর কাব্যে সমস্ত পদের বহুলতা তাই যত্রতত্র, এর ফলে কাব্যশরীরে পেলবতা কিছু কমেছে। যেমন—

তখন থাকে না মনে—দিগন্তরে
উচ্ছিষ্ট উঞ্চের বাটোয়ারা,
হিংসার প্রমারা,
স্থগিত মারীর বীজ শস্যশূন্য মাঠে ;
চ'ড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে
প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত ; নিরর্থক
পুষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক,
হিরণ্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধতম অভিপ্রেজ বল্মীকে বল্মীকে ;
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে,
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস। (সংবর্ত)

কিংবা,

প্রমাবিরহিত
অন্ধ বিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সংগতি বা পৈতৃক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক শূন্য তাকে করে বিশ্বম্ভর ;

কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু। (তদেব)

অথবা,

ধূলিকণায় নিহিত যে-অস্থিতি, ওর পূর্বপুরুষেরা
আমারে বসায়ে গেছে সে-জঙ্গম উত্তরাধিকারে।
(পথ, সংবর্ত)

শব্দকে মেজে ঘষে নিয়েই সুধীন্দ্রনাথ কাব্যে তা গ্রথিত করতেন—এ বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তির উল্লেখ করেছি, এই পরিমার্জনা তাঁর কবি-স্বভাবেরই অঙ্গীভূত। 'সংবর্ত' কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি গদ্যধর্মিতায় আচ্ছন্ন, শব্দগুলিতেও কুসুমকোমল পেলবতা নেই। 'পথ' কবিতায় 'অস্থিতি' শব্দের জন্যেই কাব্যের আবহাওয়া নষ্ট হয়েছে—বলাই বাহুল্য।
'উত্তর ফাল্গুনী' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'শর্বরী'র দ্বিতীয় পঙক্তিতে ('অব্যক্ত ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে') 'রঞ্জনে' শব্দটি এখানে আবশ্যিক মনে হবে। পরবর্তী পঙ্‌ক্তির 'অঞ্জনে' পদের সঙ্গে মিল দেবার খাতিরেই বসেছে, হেমন্ত সন্ধ্যার যে রিক্তরূপের বর্ণনা দিয়ে কবিতাটির শুরু—তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বজায় রইলো না ঐ শব্দটির জন্যে। গত-যৌবনা রূপোপজীবিনীর শারীর সৌন্দর্য ধরে রাখার মূঢ় প্রয়াসের প্রতি কবির যে ইঙ্গিত, তাকে উপমানরূপে ব্যবহারের এই দুর্লভ সৌন্দর্য-সৃষ্টির সুষমা—তা 'অত্যন্ত রঞ্জনে' ব্যবহার করার জন্যে গাণ্ডিকতার ধাক্কায় অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। এই কবিতাটির আরেক জায়গা লক্ষ্য করা যাক—

মরণের অমৃত বিকারে
স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি ম'জে
অপ্রমেয় পারিজাত কল্পনা বিতানে ফোটাবে।

'ফোটাবে' ক্রিয়াপদে কাব্য-মেজাজের লাবণ্যহানি ঘটেছে। শব্দের সৌষম্যেই কাব্যদেহের অস্তিত্ব, সুধীন্দ্রনাথ তাই শব্দ নিয়ে গবেষণা

করতে ভালবাসতেন ; কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত 'ফোটাবে' ক্রিয়াপদে দেশীয় ঝাঁজ যতই থাকুক, সুদূর বিস্তারী কল্পনার যে জাল বিস্তৃতি লাভ করেছে পূর্ববর্তী শব্দরাজিতে—তা মুহূর্তেই যেন ছিঁড়ে গেল।

সুধীন্দ্রনাথ সর্বদাই কাব্যের শব্দে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী অভিভাবের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষার চরিত্রে কেমন একটা এলায়িত শৈথিল্য আছে ; (মধুসূদন যে নামধাতুর আশ্রয় নিয়েছিলেন—তা ভাষার শিথিলতাকে দূরে সরাবার জন্যই)। সুধীন্দ্রনাথ শব্দকে সুসংহতরূপে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী করতে গিয়ে প্রচলিত শব্দ ভাণ্ডারের মঞ্জুষার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অপ্রচল শব্দরাজির ঋদ্ধিকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন। (শব্দ ব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথ নিজে ম্যালার্মের দোহাই পেড়েছেন, এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা থাকলেও ম্যালার্মের অনূদিত কবিতাবলীর সূত্র ধরে এখানে একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে—ম্যালার্মে কাব্যে ব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথেরও অম্বিষ্ট তাই ; তাঁর কবি-স্বভাবের মধ্যে ব্যঞ্জনাকে প্রধানভাবে ফুটিয়ে তোলাই একান্ত কাম্য। কিন্তু ফরাসী ভাষায় তথা ইংরাজী ভাষাতেও শব্দ-শরীরের গঠন এমনই যে তাকে সংহত ও সংযত ব্যবহারের জন্যে কসরতের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বাংলা ভাষার শব্দরাজিতে সেরকম সংযম শাসিত সংহতি অনুপস্থিত ; সেই সংহতি আনার সাধনায় সুধীন্দ্রনাথ দুরূহ এবং অপ্রচলিত শব্দরাজিকে ব্যবহার করেছেন—দুটি উদ্দেশ্যে ; একটি উদ্দেশ্যের কথা পূর্বেই বলেছি—বহু ব্যবহৃত শব্দের স্পর্শদোষ তিনি এড়াতে চেয়েছেন, আর নতুন গম্ভীর শব্দযোজনার দ্বারা কাব্যে সুসংহত রূপ দান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম উদ্দেশ্য সাধু এবং গুণ প্রসঙ্গে আমি তা আলোচনা করেছি, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের আংশিক ব্যর্থতাই বর্তমান আমার বলবার কথা।) শব্দের অপ্রচলিত চরিত্রের জন্যে কোন্ শব্দের সংশ্লেষে কোন্ ব্যঞ্জনার আভাস—তা পাঠকের পক্ষে চট করে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়, অভিধান ঘেঁটে অর্থ জেনে নিলেও অভিধা শক্তির সাহায্যে কখনোই লাক্ষণিক বা ব্যঙ্গার্থের শীর্ষ-

দেশে আরোহণ করা যায় না, পূর্ব প্রয়োগের সংস্কার-চেতনা বা বাসনা-সিঁড়ি এ বিষয়ে ব্যঞ্জনা-লোকে পৌঁছবার পক্ষে বোধহয় একটু বেশী সহায়ক। এই কারণে সুধীন্দ্রনাথের ভক্ত পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তবে সকলেই তাঁকে বড় কবি বলে জানতেন, কিন্তু কেন ও কিসে তিনি বড়, কোথায় ও কিভাবে তিনি বড় — সেই আলোচনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে কাব্যপাঠকের তথা ভক্তের সংখ্যা বড় কম।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে নামধাতু প্রয়োগের খুবই বাড়াবাড়ি। মধুসূদন এর আগে বাংলা ভাষায় প্রচুর নামধাতুর ব্যবহার করেছেন—তাঁর এপিকধর্মী কাব্যমানসের উপযোগী ভাষা সন্ধানের জন্যে তিনি বিশেষ্য পদকে ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত করে ভাষার চলন সামর্থকে সুদূরব্যাপ্ত করার প্রয়াসী ছিলেন, এতে ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ হয়, ছন্দ লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতো মুক্তগতি হয়। ইংরাজী ভাষায় প্রায় তাবৎ 'নাউন'কেই 'ভার্ব' হিসেবে ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে—এতে ভাষার সৌন্দর্য বেড়েছে বই কমে নি, এবং মনোভাব প্রকাশের সংহতিও গাঢ়নিবদ্ধ হয়েছে, এলায়িত শৈথিল্য সঙ্কুচিত হয়েছে। মধুসূদনের নামধাতু ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষা-সংস্কারের এই মনোভাব যে ছিল না—এ কথা বলা যায় না। ভাষা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের খুঁৎখুতানি ছিল, তিনি ভাষাকে সুসংহত মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, তাই শব্দ নিয়ে তাঁর কারিগরি প্রধান কবির মতোই প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের অঙ্গীভূত। তিনি অনায়াসেই 'লোভ'কে ক্রিয়াপদ করে লিখতে পারেন—

> দিন মানে তাই চতুর চিত্রভানু
> লোভায় না লঘু মরীচিকা নির্মাণে। (ভ্রষ্টতরী)

শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তিকে ব্যাপ্ত করার প্রয়াসে তিনি মধুসূদনের মতো প্রচুর নামধাতুর ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন নি। এখানে তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি নামধাতুর উল্লেখ করেছি — বিস্ফারিত, বিচরে, পাসরিল, টঙ্কারিছে, মথি, সমর্পিবে, আহরি, নেহারি, অর্গলিতে, অবলোকি, আহ্বানি, উপাড়ি, উপজিল, বিতরিল, বিকশি, সঞ্চিয়া, সংহারিল,

পশিল, সঁপিলাম, প্রমাণিল, উদ্ভাসিল, (অর্কেস্ট্রা) ; হেরিবে, নারিবে, আস্ফালিবে, সংস্থাপয়া, উন্মথি, মুখরিল, ভুঞ্জিছে, আমন্ত্রিয়া, অপহরি, পারায়ে, (পার হয়ে-অর্থে), নিরখিব, আকর্ষি, সমাপি, মন্থিছে, পরকাশি (ক্রন্দসী), বিতরি, রাজে, বিরাজে, পরিহরি, উদ্ভাসি, অবলোকি, ফুৎকারিছে, বিরচিবে, অর্পিলাম, মর্মরিছে, অভিষেকি, পরাজিতে, বাখানিতে, বর্তেছিল, অতিক্রমি (উত্তরফাল্গুনী), বিরচিব আবরি, লঙ্ঘি, অবগাহি, ঝাঁপাতে, আগলায়। (সংবর্ত) প্রভৃতি। এই সব গ্রন্থে আরও উদাহরণ আছে, তা ছাড়া 'দশমী' 'প্রতিধ্বনি', 'তন্বী' প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রচুর নামধাতুর দেখা মিলবে।

শুধু নামধাতু নয়, প্রাচীন রীতির শব্দকেও সমাদরের সঙ্গে তিনি তাঁর নবনির্মিত শব্দরাজির পাশে একশ্রেণীতে বসিয়েছেন—এতে পুরানো শব্দের মধ্যে নতুন এক তাৎপর্য আরোপিত হয়েছে। 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা' কথাটাকে তিনি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ; মোর, মোদের, হানি, কভু, তব, হিয়া, টুটিল, এরে, লভি, দরশ, সনে, হেরিবে, নারিবে, সেথা, লঙ্ঘি, জিনে, ভাতিল, যবে, টুটিবে ইত্যাদি শব্দের হামেশা আনাগোনা ঘটেছে তাঁর কাব্যে, —এতে নতুনতর তন্ময়তা যে আসে নি—এমন নয়।

অমা, প্রমা, মুমূর্ষা, অন্বিষ্ট, অরুন্তুদ, নিরিক্ত প্রভৃতি শব্দের প্রতি খুব বেশী মমতা দেখানো হয়েছে— এবং তার ফলে কবির সেই কথা 'শব্দের জন্যে শ্রমই কাব্যনির্মিতির প্রধান কৌশল'—মনে হয় সত্য। গতাসু, কবোষ্ণ শব্দের প্রতিও কবির দুর্বলতা ছিল বিলক্ষণ, যদিও বিশেষণ পদ হিসেবে এই জাতীয় শব্দগুলি ভালোই উতরেছে—

> চিন্তাও আর আগায়ে যেতে না পারে ;
> গতাসু হতাশা ; বিলাপ চেতনাহত।
> সহসা বিমুখ বাতাসে বন্ধ দ্বারে
> কার করাঘাত বাজে স্বপনের মতো ? (অর্কেস্ট্রা)

কিংবা,

লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী

অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিল দিকে দিগন্তরে

স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝংকার। (অর্কেস্ট্রা)

সুধীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও বিশেষণকে বিশেষ্যপদ হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি ; যেমন—

দুঃস্বপনের বিপর্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি (শর্বরী)

'অন্ধ' এখানে বিশেষ্যের চরিত্র-মহিমা নিয়ে বসেছে। কিংবা যখন তিনি লেখেন—'বনচ্ছায়া স্বচ্ছবিরল গ্রামের ধবল লেপে' (প্রত্যাবর্তন), তখন 'ধবল' পদের বিশেষ্য সৌন্দর্যকেই কবি প্রকটিত করেন।

শব্দনির্মিতির ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ সর্বদা ব্যাকরণের পরিশুদ্ধ নিয়মের ছাড়পত্র নিয়ে এগিয়েছেন—এমন কথা বলা যায় না, তবে তার সংস্কৃত-ভাষা এবং সাহিত্যের গভীর জ্ঞানের জন্যেই তাঁর তৈরি শব্দের চরিত্রে একটা ধ্রুপদী ভঙ্গিমা লক্ষিত হয়। যেখানে তিনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন—এমন দু' একটি উদাহরণের উল্লেখ বোধহয় আমার এই বক্তব্য বোঝার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। কবি লিখলেন—

নিরাশা নিবিড় আয়ুর অন্ত্যপ্রহরে (জন্মান্তর)।

'নিরাশা' শব্দটিকে আমরা চালিয়ে দিয়েছি, বিশেষ্য হিসেবে এটির কোনো শুদ্ধিতা নেই, মর্যাদাও নেই, ('নিরাশ' বিশেষণ পদ—এবং ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ), কিন্তু বাংলাভাষায় কিছু কবি-সাহিত্যিক না জেনেই বোধহয়, কিংবা 'প্রয়োগশুদ্ধ' ভেবে নিয়েই 'নৈরাশ্য'-এর বদলে 'নিরাশা' লিখে থাকেন। 'নিরাশ' বহুব্রীহি সমাসান্ত পদ, কিন্তু 'নিরাশা' পদকে শুদ্ধিতার কোন্ ছাড়পত্র দেওয়া যাবে? যখন সুধীন্দ্রনাথ 'এসে-ছিলে তুমি বিনিদ রাতে লেখেন' (চপলা কবিতা দ্রষ্টব্য), তখন বিনিদ পদে আপত্তির কোনো কথাই ওঠে না, বরং সুন্দর ঠেকে, ব্যাকরণের নিয়মে তাকে রক্ষা করাও যায়। কিন্তু যখন তিনি লেখেন—

এনো না, এনো না ডেকে বিবিধধর্মিষ্ঠ অশনিরে (দৈন্য)

তখন 'ধর্মিষ্ঠ' পদটি নিয়ে কথা উঠতেই পারে। কথা ওঠার একটা সঙ্গত কারণও আছে। ইষ্ঠ প্রত্যয়টি বিশেষণ পদের ওপরই অতিশায়ন অর্থে প্রযুক্ত হয় ; এখানে ধর্ম পদে ইষ্ঠ যুক্ত হয়েছে বলা উচিত নয়, আবার 'ধর্মিষ্ঠ' পদে অতিশায়নও নেই। লঘিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ কি ম্রদিষ্ঠ পদের দেখাদেখি অর্থাৎ শব্দ সাদৃশ্যের দৌলতে ধর্মিষ্ঠ পদটি যে কবি তৈরি করেছেন, (যেমন রবীন্দ্রনাথ অজস্র পদ তৈরি করেছেন—যথা 'ত্রিলোচনের' দেখাদেখি 'বিলোচন' পদ)—তা বোঝা যায়, কিন্তু ব্যাকরণগত বৈধতা রক্ষিত হয় নি। কবিতার খাতিরেই সুধীন্দ্রনাথ 'কণ্টকিত' শয়নীয়ে শুয়ে' (মৃত্যু) লিখেছেন, 'শয়নীতে' বললেও ক্ষতি ছিল না, তিনটি 'য়' ব্যবহারের অনুপ্রাসিত চমকের লোভ সামলাতে না পেরেই 'শয়নীয়ে' লিখছেন—নিশ্চয়ই অনবধানবশতঃ এই রকম নতুন শব্দে 'য়ে' যোগ করে অধিকরণ আনার চেষ্টা করেন নি।

নূতনত্বের মোহে শব্দের অর্থকে একটু সরিয়ে আনার প্রয়োগও লক্ষিত হয় তাঁর কাব্যে। একটা পঙ্ক্তি মনে পড়ছে—'আবার মাথায় ঝরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী।' এখানে 'অরুণ' শব্দকে আকাশ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'নীলারুণ' বলায় নতুন আমেজ এসেছে ঠিকই, কিন্তু অরুণকে বসিয়ে আকাশ বোঝানোর ব্যাপারটা খুব ভালো উতরেছে—বলা যায় না।

তবে কিছু বিশেষণ-ব্যবহারে কবির মুন্সিয়ানা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে, যেমন—'মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়'। রাক্ষসী বিশেষণ নতুন, এর তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী। 'হিয়া ভরা পীত স্মরণে' কিংবা 'নিষ্পুণ্য প্রত্যাখান' অথবা 'অনাম দেবতা' বা 'পাটল চাওয়া' কিংবা 'উর্বর মোক্ষ'—সর্বত্রই বিশেষণের নূতনত্ব লক্ষণীয়।

আর একটি বিশেষণের কথা মনে পড়ছে—'উলুকী অন্ধ।' পেঁচা অন্ধকার ভালবাসে, পেঁচার সঙ্গে অন্ধকারের আগে 'উলুকী' পদ বসিয়ে পেঁচার প্রিয় অন্ধকারের ব্যঞ্জনা পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ, মিল ও অলঙ্কার

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকরণে ছন্দের খুব বড় ভূমিকা আছে। তিনি মনন-প্রধান কবি, যুক্তির অবতারণা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয়, এ জন্যে কাব্যকে সংযত এবং সংহত করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তাই তাঁর কাব্য গদ্য ঘেঁষা।

আমারে তুমি ভালোবাসো না ব'লে,
দুঃখ আমি অবশ্যই পাই ;
কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে,
তাছাড়া কোনও যাতনা, জ্বালা নাই।

'আমারে' যদি 'আমাকে' হয়ে বসতো, তবে একে কবিতা বলে চেনা কি শক্ত হতো না? অথচ মজা এই যে এটি ধ্বনিপ্রধান ছন্দের চালে চলেছে, ৫ + ৭ মাত্রায় বিভক্ত হয়ে দ্বিপর্বিক হতে কোনো বাধা পায়নি! চতুর্থ পঙ্ক্তির 'জ্বালা'তে 'জ্ব' রূপতত্ত্বের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ব্যঞ্জন, কিন্তু শ্রুতিতে ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে একমাত্রিক, জ-এর ধ্বনিই কানে বাজছে। তাই কবি 'জ্বালা'কে দ্বিমাত্রিক হিসাবেই ব্যবহার করেছেন।

তাঁর কবিতা গদ্যধর্মী বলাতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না ;

এ ভুজমাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে ;
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল দিয়ে নরকে চলে গেছে॥

'হারায়েছে' যদি 'হারিয়েছে' হতো, তা হলে এটি গদ্য রচনা ছাড়া অন্য কিছু বলা যেত কি? অবশ্য ছন্দোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধ্বনি প্রাধান্য আছে, এবং প্রথম পর্ব পাঁচ এবং দ্বিতীয় পর্ব সাত মাত্রার হয়েছে।

কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ গদ্যগুণের আরোপ করতে ভালবাসতেন, এ সম্পর্কে

তাঁর একটা চিঠিও আছে—বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ চিঠিটি লেখ। এবং কবিতার 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সংখ্যা'য় (আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭) প্রকাশিত। অন্য কবির ছন্দে গদ্যগুণের বাহবা তিনি দিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজের কাব্যে গদ্যচ্ছন্দকে এড়িয়ে চলতেন, তাঁর কাব্যে গদ্য ছন্দের অনুপস্থিতি পাঠকের চোখ এড়াবে না। তাঁর সমকালীন কবিকুল, বিশেষ করে তাঁর সমগোত্রীয়রা সকলেই গদ্যছন্দে মক্স করেছেন, আর সুধীন্দ্রনাথ কাব্যে গদ্যের আমেজ সৃষ্টি করেছেন সমিল ধ্বনিপ্রধান বা তানপ্রধান পয়ার রচনা করে, তাঁর কাব্যের ছন্দ বলতে পারি গদ্যপাড়ার ধার ঘেঁষে হেঁটেছে। লক্ষ্য করুন—'সবই দেখেছিলুম আমিও, না দেখে দেখেছি ব'লে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার পরে'—এই অংশটা বিখ্যাত 'যযাতি' কবিতারই অংশ। কাব্যের কোমল পেলব নমনীয় শরীরে গদ্যের কাঠিন্য লেপন করার কাজে তিনি সদাব্রতী ছিলেন। গদ্যভাষার তেজস্বিতা এবং ওজঃগুণকে কাব্যের কায়াগঠনে কাজে লাগাতে পারলে কবিতার ভাবশৈথিল্য অনেকাংশে নিরাবৃত হবে—এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি কবিতার ছন্দে গদ্যধর্মিতা আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

অথচ ছন্দ সম্পর্কে তিনি যেমন কৃতবিদ্য, তেমনি বিবিধ রীতির ছন্দ-প্রয়োগে পারদর্শী। ছন্দ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের স্পষ্টতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু খুবই উচ্চ প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ জানতেন তিনি মননধর্মী, আবেগাশ্রিত নন, তাই তাঁকে ছন্দের লঘুতা ত্যাগ করতে হয়েছিল। গুরুগম্ভীর তথা অপ্রচলিত তৎসম শব্দের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য পাঠকের কাছে তিনি ভারিক্কি চালেই উপস্থিত করেছেন। এই জন্যেই মনে হয় তিনি তানপ্রধান ছন্দকে তাঁর কাব্যের প্রধান বাহন করেছেন, কিন্তু ধ্বনিপ্রধান ছন্দকেও বৈচিত্র্যের খাতিরে ত্যাগ করতে পারেন নি। এমনকি তাঁর মেজাজে ছড়ার ছন্দের চঞ্চলতা থাকার কথা নয়, তবু তিনি চারমাত্রার শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দেও কবিতা লিখেছেন—

কোন্ কালে সেই চকিত চোখের দেখা ;
কী জানি সে এখন কোথায় থাকে।
নিশীথ রাতে তারার চিত্রলেখা
তবু আমায় তার কাছে আজ ডাকে।

'উত্তর ফাল্গুনী'-র 'ডাক' কবিতার অংশ। এখানে বিষয়বস্তুতে গভীরতা, এবং মননশীলতায় গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে, তবু পরিষ্কার চারমাত্রার শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহার করতে কবি দ্বিধা করেন নি ; অর্থাৎ সব রকম ছন্দেই তাঁর অবাধ দখল—এ কথা বলা চলে।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবির হাতে ছন্দের বৈচিত্র্য বাজনা বাজায় না বলে যে জোরালো অভিযোগ আছে, সুধীন্দ্রনাথ সে অভিযোগের আসামী নন। অবশ্য কথা উঠতে পারে যে তিনি ত' রবীন্দ্রনাথের মতো নতুন নতুন ছন্দের নির্মাতা নন, এবং বিবিধ ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন নি। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষিত ছন্দের মহিমাকে উজ্জ্বল করে তুলতে তিনি ছন্দোগুরুকে অনুসরণ করার সাহস দেখিয়েছেন—এবং যে সব দুরূহ ধ্বনিপ্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন—সে সব ছন্দের ব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য দেখাতে পেরেছেন। এও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ছন্দের কান তাঁর তীক্ষ্ণ ; পাঠকের কান যদি তাঁর মতো শাণিত না হয়—তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর ছন্দ-ব্যবহারে সংশয় জাগতে পারে। যে মুহূর্তে তাঁর সূত্রটি ধরতে পারা যাবে, তৎক্ষণাৎ সেই সংশয় দূরীভূত হবে। দু একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যাক। নিচে ধ্বনি প্রধান চালের একটি ছন্দ আছে, তার পর্ববিভাগ হল—৬+৬+২।

আমার কথা কি/শুনতে পাও না/তুমি
কেন মুখ গুঁজে/আছ তবে মিছে/ছলে ?
কোথায় লুকাবে ?/ধু ধু করে মরু/ভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া/ম'রে গেছে পদ/তলে।

অনেকেই এই কবিতার পঙ্‌ক্তির পর্ববিভাগ করেছেন ৬+৮ করে।

(কিন্তু তান প্রধান রীতির তথা পয়ারের ৮+৬ নয়, কেন না ছন্দের চাল হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত প্রকৃতির)। এই কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি—

প্রাকপুরাণিক/বাল্যবন্ধু/যত

'বাল্যবন্ধু'তে ছ' মাত্রা রয়েছে 'ল্য' এবং 'ন্ধু' সংযুক্ত ব্যঞ্জন, তাই 'বা' এবং 'ব' দ্বিমাত্রিক গণ্য হয়েছে। এখানকার যুগ্ম ব্যঞ্জন শোষণশক্তি-রহিত, সুতরাং রীতি তানপ্রধান নয়। এই কবিতারই দ্বিতীয় স্তবকের মাঝামাঝি একটি পঙ্‌ক্তি হল—

মরুদ্দ্বীপের খবর তুমিই জানো

তুমি তো কখনও বিপদ্ প্রাজ্ঞ নও।

'মরু-দীপের' পড়লে ছন্দপতন মনে হবে, পড়তে হবে 'মরুদ্ দীপের'। 'মরুদ্বীপের' ষান্মাত্রিক, 'রু' দ্বিমাত্রিক। পরের পঙ্‌ক্তিতে 'তুমি তো কখনও' সাত মাত্রার মনে হতে পারে, কিন্তু, 'তুমি তো কখনো' পড়লেই ল্যাঠা চুকে যায়।

সুধীন্দ্রনাথ বর্ণ সংখ্যার গণনাকে ছন্দে প্রাধান্য দেন নি, আক্ষরিক (অক্ষর অর্থাৎ syllable সম্পর্কিত) চলনকেই বড় বলে মেনেছেন। 'বর্ষশেষ' কবিতা থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলছি—

দহনক্লান্ত দুপুরবেলার বাঁজে

অন্যমনে চলেছিলুম রিক্তপথের মাঝে।

ছিল নাকো অন্তরে আর আশা;

দুঃস্থ মাথার চিন্তাগুলো কণ্ঠে খুঁজে পাচ্ছিল না ভাষা।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দের আভাস থাকলেও আসলে এটি ছড়ার ছন্দে লিখিত, প্রতি পর্বে রয়েছে চারমাত্রা। এই কবিতার শেষদিকে দেখছি—'চমকে উঠে দেখলুম চোখ তুলে' পঙ্‌ক্তিতে 'দেখলুম চোখ'-কে চার মাত্রায় খাপ খাওয়ানো হয়েছে—একটু কি ওজন কম ঠেকছে না? তাঁর বিখ্যাত 'ডাক' কবিতায় আবার ভারী হয়েছে চারমাত্রা-প্রায় বিরাশী সিক্কার মতো; যেমন—

চুকিয়ে দিয়ে পাওনা-দেনা যত

দাঁড়িয়ে আছি খেয়াঘাটের পারে।

এখানে 'দাঁড়িয়ে আছি' কেও চারমাত্রায় পোরা কি ঈষৎ কষ্টসাধ্য কর্ম নয়?

সুধীন্দ্রনাথ পর্বাঙ্গে মাত্রা ব্যবহারের স্বাধীনতা গ্রহণ করতে নির্দ্বিধ ছিলেন। যেমন—

সাহারা গোবি ছেয়েছে ভাঙা পণে,

মরমহিমা হয়েছে ছেলেখেলা॥

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্ব ৩+২ মাত্রায় গঠিত, কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্ব তৈরি হয়েছে ২+৩ মাত্রায়।

সুধীন্দ্রনাথ পদের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বতার ওপরে ছন্দের প্রকৃতিকে নির্ভরশীল করতে চান নি। তাঁর কাছে মনে হয়েছে—পর্বের আকার এবং পর্বাঙ্গের বিন্যাসেই ছন্দের বৈচিত্র্য।

এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মিল সম্পর্কে দু একটি কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না। তিনি সমিল কবিতা লিখতেন, অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি তাঁর বেশ দুর্বলতা ছিল। আর সব রকমের মিলই তিনিই দিয়েছেন, কখনো উত্তম মিল, কখনো বা মধ্যম কিংবা অধম মিল। আবার অভাবিতপূর্ব মিলের চমকও তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয়, যেমন— দ্রবী-ভূত/অভিভূত, নগণ্য পাথেয়/তোমার ভাতেও, পলাশে/বলা সে, আগামী/লাগামই, একাকী/দেখা কি। মধ্যম মিলের নিদর্শন কিছু দিই --মত্ত/সত্য, জিজ্ঞাসু/গতাসু, হঠাৎ/অচিরাৎ, অমরা/পসরা, প্রভাতে/সভাতে, ইন্দ্রজালিক/অলীক। কিন্তু কবরী/প্রহরী মধ্যম মিলের কোটারিতেও পড়ে না।

অলঙ্কার-ব্যবহার

সাদা কথাকে সাদা ভাবে উপস্থাপনার মধ্যে চারুত্ব থাকে না, তাতে কবিত্ব ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করাও যায় না। কবিকে বলা-কথার আড়ালে না-বলা ভাবকে ব্যক্ত করতে হয়। তাই কবিকে অলঙ্করণের ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়। স্বল্প ঘোমটা-ঢাকা মুখের সৌন্দর্য দেখার ব্যগ্রতা জাগে—কেননা সামান্য দেখার খেই ধরে অদেখা পরিচয়লাভের বাসনা স্বাভাবিক। কবিরা কাব্য-দেহে কথার মাধ্যমে যে চারুত্ব সৃষ্টি করেন, তাকেই অলঙ্করণ বলে। বড় কবি মাত্রেই অলঙ্করণের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে থাকেন, সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা বিবিধ অলঙ্কারের সমাবেশ দেখি। তাঁর সৃষ্ট অলঙ্কারগুলি কাব্যসৃষ্টির সহজাত বলেই মনে হয়েছে, এদের পেছনে কোনো বাড়তি প্রযত্ন নেই।

কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—উপমাই কবিত্ব। একদিক থেকে কথাটা বড় খাঁটি, যে কবি উপমার বৈচিত্র্যে যত বেশী মুন্সিয়ানা দেখান—তিনি পাঠকের কাছে তত বেশী প্রিয়। জীবনানন্দ এজন্যে অভূতপূর্ব সমাদর পেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারে কম যান না। তাঁর কয়েকটি উপমার উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

(১) ভালো লেগেছিল ওই উদ্দাম, উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্তস্পর্শে ধান্যসম, কেলিপরায়ণ।

(২) ঘুরে বেড়ায় আকুল হয়ে ক্ষণিক খুশির খামখেয়ালী ছবি
শরৎ সাঁঝের নকশাবহুল খণ্ড মেঘের মতো।

(৩) ভয়ার্ত অশ্বের মতো, ছুটেছিল বিলুপ্তির পানে
আমার উন্মুক্ত আত্মা মুমূর্ষার টানে॥

(৪) হচ্ছিল বোধ অবুঝ হৃদয় খানা
কুলায়বিমুখ চিলের মতো মুক্তাকাশে প্রসার করে ডানা

(৫) তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাত আমার পায়ে বেণুমুগ্ধ কালীয়ের মতো ?

(৬) বেপমান তারাদল বেগজাত বুদ্বুদের প্রায়।

সুধীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় উপমা হল—নটী বা রূপোপজীবিনীকে উপমান হিসেবে উপস্থিত করা ; সেই জাতীয় দু একটি উপমার উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

(১) দীর্ঘায়িত নিশা
বয়ঃস্ফীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় আজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।

(২) সহসা হেমন্ত সন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে।

(৩) এমন সময় আড়াল থেকে রঙ্গনিপুণ নাগরিকার প্রায়
প্রাণদেবতা হঠাৎ ছুঁড়ে মারলে আমার গায়
পীত লোহিতের চূর্ণমুঠি গুলমোরের ফুলে।

(৪) এসেছে মুমূর্ষু দিবা লুপ্তকীর্তি নর্তকীর প্রায়
অক্ষম জরার লজ্জা লুকাতে হেথায়।

অন্যান্য অলংকারের প্রতিও কবির আসক্তি কম নয়। রূপক ও সমাসোক্তি অলংকারগুলি লক্ষ্য করা যাক।

(১) গতাসু আলোর প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে।

(২) স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা।

(৩) আয়ুর সোপান মার্গ বহু কষ্টে অতিক্রম করি
উন্মুক্ত মৃত্যুর প্রান্তে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়েছি এসে।

(৪) জীবনগণিকা
ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি প্রসাধনে ঢেকে,
সার্বজন্য অভিসারে ডেকে
ভুলাবে কি আত্মহারা পুরাণপুরুষে ?

(৫) অমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে।

(৬) শুধু এই বৃদ্ধ বনস্পতি
মুহুর্মুহু জটা নেড়ে ব্যক্ত করে কী নিষ্ঠুর ক্ষতি।
দুর্মর শৈশবসখা বিকলাঙ্গ বায়ুর নিকটে।

(৭) উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল সপ্তাশ্ব শকটে
সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ।

(৮) নেত্রসার কপোল প্রধান
প্রাক প্রচ্ছদ নটী যেন। (উৎপ্রেক্ষা)

এছাড়া শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস ব্যবহারে তাঁর পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী, এবং স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণের—উভয় প্রকারের অনুপ্রাসিত মাধুর্য সৃষ্টির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

(১) অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম, অচঞ্চল তাদের প্রগতি।
(২) অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি।
(৩) নির্বল, নির্ভরশীল, নিরুপায় দুলালের মতো।
(৪) সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে।
(৫) ঝলে না কালো চপলা চল চোখে।
(৬) মুখর কলহালাপ, কুহরণ, কুজন, কাকলী
কখন হয়েছে মূক।

অলঙ্কারে-ব্যবহারের বাহাদুরির মধ্যে কবির কাব্য-সৌন্দর্য নিহিত আছে। কবি যখন বলেন—'রেশমী কেশের ঘন কুঞ্চিত লহরে'—তখন আমরা বুঝি কেশই কুঞ্চিত, লহর নয়; ইংরাজীতে যাকে Transferred epithet বলা হয়, এ সেই জাতের অলঙ্কার। কবির হাতে এই

জাতীয় অলঙ্কার অনায়াসেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে আসে না স্তব্ধ অন্ধকারে'—এখানে নিশ্চয়ই অন্ধকার স্তব্ধ নয়। কিংবা, 'বেষ্টনীর কুটিল-কৌতুক ছারখার করি' বললে কৌতুক যে কুটিল নয়—তাও বোঝা যায়। 'তোমার সর্বাঙ্গে নামে আর্ত পক্ষাঘাত'—রোগী আর্ত না পক্ষাঘাত আর্ত?

সুধীন্দ্রনাথ অলঙ্কার ব্যবহার করে উপমানের কিছু কাজের পরিচয় দেবার মধ্যেও সৌন্দর্যের সৌরভ বিকীর্ণ করতেন, যেমন—

অবুঝ হৃদয়খানা।
কুলায়বিমুখ চিলের মতো মুক্তাকাশে প্রসার করে ডানা
দিচ্ছে পাড়ি মৃত্যু অভিযানে
আত্মঘাতী ঊর্ধ্ব রবির অগম-চিতার পানে।

এই জাতীয় উপমার দু' একটি উদাহরণ আগেই দিয়েছি। এসেছে মুমূর্ষু দিবা লুপ্তকীর্তি নর্তকীর প্রায়/অক্ষম জরার লজ্জা লুকাতে হেথায়।' নর্তকীর কীর্তি এখন লুপ্ত, সে দেশে দেশান্তরে খুইয়ে এসেছে তার উদ্দীপ্ত যৌবন, সেই যৌবনহারা নর্তকীর মতোই মুমূর্ষু দিনের আগমন। নিচের উদাহরণে তিনি শতাব্দীর বিফলতা বা নৈরাশ্যকে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দ্রুত ওপরে ওঠা-ব্যক্তির যে ছোট ছোট ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ে—তার সঙ্গে তুলনা করেছেন, খুব হাঁপাতে থাকলে লম্বা টানা নিশ্বাস নেওয়া যায় না।—

একাধিক শতাব্দীর বৈফল্য, নৈরাশ,
শাশ্বতের তুলনায় তাহা যেন সংক্ষিপ্ত নিঃশ্বাস
দ্রুতগামী সোপানারোহীর।

'বেপমান তারাদল বেগজাত বুদ্বুদের প্রায়' বলে তিনি তারকাকে শুধু বুদ্বুদ বললেন না, বুদ্বুদের কাজও ব্যাখ্যা করে উপমেয়ের চরিত্রে তা আরোপ করলেন। তাঁর 'নান্দীমুখ' কবিতার বিখ্যাত অলঙ্করণটির উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানি—

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে;
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে,
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটিকা জ্বলে।

সুধীন্দ্রনাথ কি ক্লাসিসিস্ট ?

জীবনানন্দ সম্পর্কে সবচেয়ে চালু অভিধাচিহ্ন যেমন 'নির্জন', সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তেমনি সবচেয়ে চালু বিশেষণ হলো 'ধ্রুপদী'—অর্থাৎ তিনি ক্লাসিক কবি। কোনো কোনো সচেতন সমালোচক এই উক্তিকে সংশোধন করে তাঁর রীতি প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বলেছেন, বলেছেন তিনি ধ্রুপদী রীতির কবি। দুরূহ অপ্রচলিত কিছু তৎসম শব্দ-ব্যবহারেব জন্যে কিনা জানি না, সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ততম পরিচয়সূচক রায় হচ্ছে—তিনি ধ্রুপদী কবি।

ক্লাসিক অর্থে ধ্রুপদী শব্দটি শোনা যায় সুধীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করেছেন। শব্দনির্মাণের এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের কথা অস্বীকার্য নয়, আগেই এ বিষয়ে বলেছি। কিন্তু ধ্রুপদী কবি বলে তাঁকে আখ্যাত করা কতদূর সঙ্গত বা সমীচীন, আমাদের তা বিচার করে দেখা দরকার, এবং এই বিশেষণের শিরোপায় কবিকে ভূষিত করে আমরা তাঁর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধান্বিত তারও একটা আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

ঐতিহ্যের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের আনুগত্য ছিল প্রচণ্ড রকমের। তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং কোনো কোনো বিদেশী কবির ভাবাদর্শ এবং প্রকরণ পদ্ধতি নিজের অন্বিষ্ট বলে মনেও করতেন—'সংবর্ত' 'গ্রন্থের ভূমিকাতে তা উল্লেখও করেছেন—"মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট।" তৎসত্ত্বেও দেশীয় সংস্কার তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি, বরং বেশী করেই আঁকড়েছিলেন। তাঁর কাব্যে ভারতীয় পুরাণের যত রেফারেন্স আছে, তাঁর সমকালীন অন্য কোনো আধুনিক কবির রচনায় তা নেই, বিদেশী পুরাণ বা ইতিহাসের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর একটা আত্মিক

টান ছিল, সেইজন্যেই বোধহয় তিনি দেশীয় ভাষার মহিমা প্রকাশেও ব্যগ্র ছিলেন। তৎসম শব্দের প্রতি যে তাঁর ঐকান্তিক মোহ তার কারণও বোধহয় এই। সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডারকে তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। এ সব আলোচনা এর আগেই করা হয়েছে। ক্লাসিক-ধর্মী লেখকরা সর্বদা ভাষার ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেন, পক্ষান্তরে রোমান্টিক কবিরাই চেষ্টা করেন ভাষার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে ; সুধীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এই প্রয়াস লক্ষিত হয় না বলে গোড়াতেই তাঁকে ক্লাসিক রীতির কবি বলা হয়ে থাকে।

শব্দ নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং অর্থ মাহাত্ম্য প্রচার করে কবিকে সাহায্য করতে যেন ব্যবহৃত হয়েছে—এই রকম ভাবেই ধ্রুপদী কাব্যের শব্দ গ্রথিত হয়, সুধীন্দ্রনাথ নিজের শব্দ সম্পর্কে প্রখরভাবে সজ্ঞান ছিলেন, এবং যথার্থ ও উপযুক্ত শব্দ-সন্ধানের জন্যে তাঁর পরিশ্রমের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এই জন্যই তাঁকে ধ্রুপদী বলা হয়েছে এবং প্রথম এক-জন কিছু বললেই পরবর্তীয়েরা পুনরক্তি করবেন—এতে আর দোষ কোথায় ?

ক্লাসিক বলার অবশ্য আরো অন্য কারণ আছে। সুধীন্দ্রনাথে রোমান্টিক চেতনা আছে—আমরা সে কথায় পরে আসছি. কিন্তু তিনি কিছুটা বস্তুবাদীও, তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় দেহবাদের সহজ ভোগমত্ততার স্পষ্ট ভাষণ গুহায়িত ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। (যদিও প্রেমের কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই কবির রোমান্টিকতারও শেষ নেই, তবু আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ শব্দ কাঠিন্যের জন্যই তাঁকে নিছক দেহবাদী মনে হয়)। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ইতিহাস চেতনা এবং কাল-জ্ঞানের স্পষ্ট পরিচয় আছে, ক্লাসিক রীতির কবিদের কালচেতনাকে এড়িয়ে চলার উপায় নেই এবং ঐতিহাসিকতাও ধ্রুপদী সাহিত্যের একটি লক্ষণ।

তবু তাঁর রচনাকে ধ্রুপদী বলা চলে না। কেন চলে না সে বিষয়েও যুক্তি আছে। অবশ্য কোনো কবিকে নিরঙ্কুশভাবে নির্দিষ্ট অভিধায়

বা প্রকরণ-লক্ষণের আধিক্যবশত একটা তকমায় এঁটে দেওয়া ঠিক নয়। যিনি যথার্থ রোমান্টিক, তাঁর মধ্যে ক্লাসিক রীতির কিছু লক্ষণ থাকে, আবার যাঁকে আমরা ধ্রুপদী কাব্যের রচয়িতা বলে জানি, তাঁর মধ্যেও রোমান্টিসিজমের প্রকাশ দেখে থাকি। তবে যাঁর মধ্যে যে লক্ষণ বেশী, তাঁকে সেই রীতির কবি বলেই চিহ্নিত করা হয়। সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্লাসিক রীতির যে সব লক্ষণ আছে—যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তার চেয়ে তাঁর মধ্যে ঢের বেশী রোমান্টিক কবির সংবেদন রয়েছে, তাঁর লেখাতেও রোমান্টিসিজমের দ্যুতি প্রচণ্ড-ভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে সুতরাং তিনি কি সত্যই ক্লাসিক না রোমান্টিক —এই বিষয় নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে।

সামাজিক জীবনের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল এবং চিরায়ত সৌন্দর্য ছাড়া যেমন ধ্রুপদী কবির আর কিছু অন্বিষ্ট নয়, সুধীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-সাধনায় বর্তমান জীবনকে এড়িয়ে তেমন করে সৌন্দর্যসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন না, এমন কি প্রেমের স্মৃতি অনুধ্যানেও তিনি সাময়িক রূপ-বিহ্বলতা এবং অবৈকল্যের ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছেন—যা ধ্রুপদী রীতির কাব্যের পরিপন্থী।

সুধীন্দ্রনাথ মূলতঃ নৈরাশ্যবাদী। (আশার কথা যে দু একটি কবিতায় ধ্বনিত হয় নি—তা নয়)। এবং নৈরাশ্যের আবর্তে সংক্ষুব্ধ কবির চিত্তে ক্লাসিকাল স্থৈর্যের অবস্থিতি কোথায়? নরক কবিতায় তাই তিনি লিখেছেন—

> "বমনবিধুর
> আমার অনাত্ম দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে
> মৌন নিরালোকে
> ভুঞ্জে তারে খুশি মতো গৃধ্নু নিশাচর।
> দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ দুস্তর।
> মনে হয় তাই

আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী :
তাহার বিখ্যাত রাখি,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু উর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে ॥"

(নরক, ক্রন্দসী)

এ কথা কোনো ক্লাসিসিস্ট কবির কণ্ঠে কি ধ্বনিত হতে পারে? বিশ্বাসে, স্থির প্রত্যয়ে যে কবি স্থিতিলাভ করেছেন—তিনিই ত' সত্যিকার ক্লাসিসিস্ট ! ভঙ্গুর জীবনের বেদনায় যিনি কাতর, আশার আলো যাঁর চোখে অবসিত—

"বিক্ষিপ্ত নৈরাশ্যকণা পুঞ্জীভূত হয়ে ঘন মেঘে
হানিছে জীবনাকাশে বিরঞ্জন আঁধার সমতা—"

তাঁকে ক্লাসিসিস্ট বলা যাবে কোন্ যুক্তিতে ? তিনি রোমান্টিক কবির অনন্বয়-জর্জর বেদনামথিত আর্তিতে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন না—

"হৃদয় তবু বিষাদে ভরে ওঠে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই ;
পাই না ভেবে শান্তিতে কী হবে,
সাধনাতে যে সিদ্ধি হেথা নাই ॥
নন্দনের বদ্ধ দ্বার, জানি,
যাবে না খুলে তোমার করাঘাতে ;
অমৃতযোগে প্রেতের কানাকানি ;
ঘুচাবে ভেদ তৃপ্তি-শোচনাতে ॥" (নিরুক্তি, উত্তরফাল্গুনী)

এই জাতীয় আরো কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যেও দেখানো যেতে পারে যে বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ ভাবনার দিক থেকে তিনি যে আদৌ ক্লাসিক নন— তা বোধকরি বিস্তৃতভাবে উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির জীবনচাঞ্চল্যের মুহূর্ত-কাল পর্যন্ত তিনি কবিতা লিখেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরন্তর প্রযত্নের ফসল হিসাবে তিনি তাঁর রচনার গায়ে লেবেল এঁটেছেন; রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি তাঁর ধাতে সয় নি, নতুন পথে রোমান্টিক কবিদের অতি তরল অতি শিথিল কাব্য প্রকরণ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য কাব্য-ভাষাকে নিজের মতো করে গড়ে নিলেন, সেখানে তিনি নিজের মনকে যেমন ব্যক্ত করতে চাইলেন, মননকেও ঢের বেশী প্রকাশ করলেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই দিকটিতে বিশেষ জোর দিতে ভোলেন নি—"সুধীন্দ্রনাথের তন্নতন্ময়তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর অভিজাতিক সুমিতি, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক, তার দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর।"

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-বিষয়ের একটা বড় ভগ্নাংশ হলো প্রেম; বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে জৈব জীবনের আসঙ্গলিপ্সার পটভূমিতে প্রেমের অনুভূতি তাঁর কাব্যে নানাভাবে ধরা আছে। কাল-চেতনায় কবি গভীরভাবে সুস্থিত। কবির কাব্য-রচনা-কাল একটা অস্থির ও অনিশ্চিত যুগের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে কেটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের Impact প্রাচীন মূল্যবোধগুলিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে, স্বাধীনতার প্রাক্কালেও মানুষের মনে সুস্থির শান্তির আদর্শ পরম বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো এসে হাজির হয় নি, অন্তত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই পরম বিশ্বাসের একটি শান্ত মূর্তি দেখা যায় নি। এমন কি, সে সম্পর্কে একটা নিশ্চিত খবর পর্যন্ত নেই। যুদ্ধকালীন অস্থিরতার সময়, জাতিকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার যুগে স্থৈর্যের পরিচয় মেলে না। বিশ্বাসের তখন প্রাগূষা— তাই চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতার মধ্যে সুশৃঙ্খল সংহতির দেখা পাওয়া ভার। স্থির নিশ্চয়তার এবং স্থিতধী প্রজ্ঞার কাব্য অস্থিরতার মানসি-

কতায় জন্ম নেয় না। পণ্ডিতেরাও তাই বলেন—Classicism only emerges in periods of stability both social and cultural. শ্রীযুক্তা দীপ্তি ত্রিপাঠীও বলেছেন—"ক্লাসিক মেজাজ কাব্যে যেমন একটি শৃঙ্খলা ও সংহতি আনতে পারে তেমনি পারে ধর্মবিশ্বাস যা মেটাফিজিক্যাল কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এই নোঙরের সন্ধান পান নি। অথচ সৎ কবির অন্বিষ্ট সত্যের অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল সমন্বয়—'to explore reality and to order experience.' কোনো বক্তব্যধর্মী কাব্যাদর্শের মধ্যেই তিনি তা পেলেন না বলে ব্যঞ্জনাধর্মী প্রতীকী কাব্যাদর্শে আশ্রয় খুঁজলেন।"

ক্লাসিক রীতির কবিরা বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কিন্তু রোমান্টিক পদ্ধতির কবিরা ব্যঞ্জনাকেই কাব্যের প্রাণ বলে স্বীকার করেন, এবং ব্যঞ্জনা আরোপের জন্যেই তাঁদের প্রযত্ন ব্যয়িত হয়। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যঞ্জনা আরোপের আধিক্য কোনো পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না, সুধীন্দ্রনাথ কবিতার মধ্যে এমন এক একটি শব্দ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন—যার ব্যঞ্জনা কবিতার ভাবটিকে সুদূরব্যাপ্ত করে তুলেছে। নায়িকার বর্ণনায় তিনি যখন 'লাইলাক সৌরভে' তাকে মাধুর্যদান করেন—তখন 'লাইলাক' শব্দটি নিজের গণ্ডী ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নায়িকা যখন এই ফুলের সৌরভে রম্যতা লাভ করে লোভনীয়, তখন নায়িকার জগৎ আর কোনো সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ হলো না—তাও দূর ব্যাপ্ত হলো, শব্দটির ব্যঞ্জনা একে নিজের পরিসীমা ছাড়িয়ে দূরে ছড়িয়ে দিলে। কবি যখন লেখেন—

ভালো লেগেছিল ওই উদ্দাম, উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্ত স্পর্শে, ধান্যসম, কেলিপরায়ণ

(মার্জনা, অর্কেস্ট্রা)

—তখন নায়িকার কেশের বর্ণ পাকা ধানের মতো মনে হলেও শব্দটি কি ব্যঞ্জনা এনে দেয়? নায়িকা যে বিদেশিনী, বিশ্ববাসিনী—তাকে ভালো লাগে, অথচ তাকে একান্ত করে কাছে পাওয়া যায় না (তাই

বিদেশিনী ভাবার বোধহয় যৌক্তিকতা)—তারই স্মৃতি রোমন্থন করছেন কবি—তার প্রতিভাস জাগে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় একটা বিদ্রোহের মেজাজ আছে, তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির কাজ হবে একটা পরম উপলব্ধির গালা রচনা করা। অভিজ্ঞতা যখন বিশৃঙ্খল, তখন তাকে বাগ মানাতে কবিকে দ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। সুধীন্দ্র-নাথ লিখছেন—"কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন। বৈরাগ্যের দ্বারা, ত্যাগের সাহায্যে, আভিজাতিক মর্যাদাবোধের নির্দেশে এ সিদ্ধি পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ কবিকে শুচিবায়ু বর্জন করে চলতেই হবে, পুরাতন স্মৃতির অনুসারী না হয়ে কবিকে কি শব্দচয়নে, কি ছন্দ প্রকরণে দ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে ; আর এই দ্রোহ-ই হচ্ছে রোমান্টিক কবির মনোধর্ম। সুধীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ দ্বন্দ্বে যতটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশী কাব্যের কায়াগঠনে—শব্দের উদ্ভাবনে। বিষয়বস্তুতেও দ্রোহিতা লক্ষ্যণীয়। ঈশ্বর তাঁর কাছে 'নিহত বিধাতা'। (রোমান্টিক কবিকুলের কাছে ঈশ্বর ত' মৃতই !)

> শূন্য নভে
> রিক্ত প্রতিষ্ঠান—স্ফীত অট্টহাসি ভরি,
> উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্নবেদ—বেদান্তের পাতা,
> বলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা।

(বিস্মরণী, অর্কেস্ট্রা)

কাব্যে তিনি 'অনেকান্ত জড়বাদে'র আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে ঘোষণা করেছেন—সেই জন্যেই কি 'বিস্মরণী' কবিতায় অনীশ্বর জড়বাদী চেত-নার উপলব্ধি প্রকাশ করছেন ? না চিরাচরিত বিশ্বাসকে দ্রোহিতায় তছনচ করছেন ? নিরীশ্বরবাদিতাই যদি তাঁর প্রতিপাদ্য হতো—তাহলে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ক্রন্দসী'তে ভগবানের কাছে প্রশ্ন করতেন না। 'প্রশ্ন' কবিতায় ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে কবি বলছেন—

হায়, ভগবান,

হায়, হায় ব্যর্থ ভগবান,

তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে ?

(ক্রন্দসী)

এই নম্র জিজ্ঞাসায় মিশেছে ঈষৎ অভিযোগ, ভগবান বুঝি শক্তিমানের পক্ষে, দুর্বল বা নিঃস্বের প্রতি করুণাবহ নন, তাই কবি ঈশ্বরকেই প্রশ্ন করেছেন—

আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ

নও তুমি নাম মাত্র ;

তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান ?

(তদেব)

সুতরাং কবির ঐশ্বরিক বিশ্বাস দ্বিধাগ্রস্ত—এই দ্বিধা রোমান্টিক কবিরই লক্ষণ, ক্লাসিসিস্টদের নয়।

রোমান্টিক কবিরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খুব বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকেন, এবং ব্যক্তিত্বকেই প্রাধান্য বা সর্বস্বতাদান করতে কুণ্ঠিত হন না—

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত :

বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দুরন্ত তারায়

উধাও মনের আগে ; মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়,

ফলায় যে কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত ;

যেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত।

হিরণ্ময় পাত্র, তথা দুর্নিরীক্ষ্য পুষার কারায়

স্বরাট্ স্বরূপ লুপ্ত ; দেশ-কাল আমাতে হারায়,

অথচ অন্বিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত ॥

(সোহংবাদ, সংবর্ত)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন রোমান্টিক কবির অন্বিষ্ট, তেমনি সুদূরপ্রসারী

কল্পনার রশ্মিজাল বিস্তারও রোমান্টিক কবি-কর্মের একটি বড় লক্ষণ। সুধীন্দ্রনাথের কল্পনাবিস্তার দূরব্যাপ্ত—তাঁর যে কোনো গ্রন্থেই এর প্রচুর উদাহরণ মিলবে, সুতরাং তাঁকে তবু ক্লাসিসিস্ট বলেই কি চিহ্নিত করবো ?

ধ্রুপদী রীতির কবিকে শুধু শব্দচয়নের বা সংহত ভঙ্গির মাধ্যমে চিহ্নিত করা ঠিক হবে কি ? ক্লাসিসিজম্ কি শুধু কাব্যের বাহ্যিক অঙ্গে বা আবয়বিক চারিত্র্যেই সর্বস্বতা জাহির করে অবস্থান করবে ? কাব্যের অন্তরঙ্গে তার কোনো লক্ষণ থাকবে না ? নৈরাশ্যজর্জর যিনি, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও যাঁর সুস্থির বিশ্রাম নেই, চিরন্তনতা বলে যাঁর কাছে মূল্য নেই, ক্ষণবাদেই যাঁর মতি বাঁধা পড়ে গেছে—প্রেমের ব্যাপারেও যাঁর চঞ্চল অস্থিরতা—তাঁকে কি করেই বা ক্লাসিক্যাল বলা যাবে ?

অর্কেস্ট্রা

'অর্কেস্ট্রা' সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ; এটি প্রথমে ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। পরে ঈষৎ সংস্কার-সাধিত হয়ে ১৯৫৪ সালে সিগনেট প্রেস থেকে পুনরায় বের হয়। প্রায় উনিশ কুড়ি বছর পরে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় কবি এই বইয়ের কবিতাগুলির পরিমার্জনায় বেশ খানিকটা প্রযত্ন ব্যয় করেছেন। তাঁর চিন্তার ধার এবং ধারা বদলেছে, তাই ১৯৩৫ সালে যে গতানুগতিক অনুবৃত্তি তাঁর পুঁজি ছিল, তা ১৯৫৩-৫৪ সালের পরিণত বয়সের কবির কাছে নিজস্ব সম্পদ বলে গ্রাহ্য হয় নি। "অর্কেস্ট্রায় রবীন্দ্রনাথের একাধিক পঙ্‌ক্তি তো জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এসে গেছেই, এমনকি সাধু ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী যে-সান্ধ্য ভাষায় সে কালের (বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে) অধিকাংশ বাংলা কবিতা লেখা হত, তাই এ গ্রন্থের বাহন। তাছাড়া অন্ত্যানুপ্রাসের চাহিদায়, তথা ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে, শব্দের বিকৃতি পাদপূরণের জন্যে ক্রিয়াপদের গ্রাম্যরূপ অথবা বর্ণ-সংকোচ ও বৃদ্ধি, হওয়া ও করা ধাতুর পৌনঃপুন্য সম্বোধনের অনাবশ্যক বাহুল্য ইত্যাদি বাংলা পদ্যের সুপ্রচলিত যথেচ্ছচার অর্কেস্ট্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল, এবং এর নায়িকা যদিও বিংশ শতাব্দীরই তরুণী, তবু তার অঙ্গে যেমন নূপুরাদি প্রাচীন ভূষণের প্রাচুর্ভাব, তেমনই তার সঙ্গে আলাপে ও আচরণে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট" (অর্কেস্ট্রার ভূমিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ)। এই চিন্তা-তাড়িত হয়ে তিনি পূর্ব প্রকাশিত কবিতাগুলির কিছু কিছু সংস্কার করলেন। 'অর্কেস্ট্রা' প্রথম বের করার সময়েই কবি এই গ্রন্থের কিছু কবিতার কাব্যাদর্শ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন, এবং কিছু কবিতার রচনাগত দোষও তাঁকে পীড়িত করেছিল ; তখন তিনি ওই সব কবিতায় 'ভাবের অগতি ও ছন্দের অসংগতি দেখেও

সংস্কারের চেষ্টা' করেন নি, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বিনা সংশোধনে তিনি এই গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত করেন নি। 'তবে সর্বত্র, এমনকি যেখানে সমস্ত উলটে-পালটে গেছে সেখানেও. প্রয়াস পেয়েছি যাতে বর্তমান পরিবর্তন, তখন যে-ক্ষমতাটুকু ছিল, তাকে ছাড়িয়ে না যায়; এবং সংগতির তাগিদে মাঝে মাঝে চিত্রকল্প আগা-গোড়া বদলেছি বটে, তবু জ্ঞানত কোথাও অর্থগৌরব বাড়াতে চাই নি' (তদেব)।

'অর্কেস্ট্রা'য় কবি আত্মকথনের মাধ্যমে তাঁর নায়কের কথা ব্যক্ত করেছেন, এটি সুধীন্দ্রীয় রচনার একটি বৈশিষ্ট্য—তা আগেই বলেছি। এখানে সেই নায়ক ভোগতৃপ্ত প্রেমের অবসানে স্মৃতি-ভারাতুর, মধুর বিষাদে খিন্ন। নায়িকা বিদেশিনী, প্রবাসে অবস্থানকালে তার সঙ্গে আলাপ, রভস মগ্নতার স্বপ্নলীন আনন্দ-স্মৃতিতে নায়ক উদ্বেল।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী'-কে এই বইয়ের মুখবন্ধ হিসেবে গ্রহণ করা চলে। হেমন্ত শূন্যতার ঋতু, ফসলের পরে মাঠের রিক্ত অবস্থা, সন্ধ্যা শিশিরসিক্ত, বৃক্ষস্খলিত পত্রে ঢাকা নির্জন বনবীথি, শেওলা ঢাকা হ্রদ, নিশাক্রান্তবিষণ্ণ বলাকা—সব মিলিয়ে কবির মনোলোকে মুগ্ধতার একটি ছোপ লাগিয়েছে। নীরব, নশ্বর, অবজ্ঞেয়, অকিঞ্চনের রুচির তথা মায়াময় একটা মহিমা কবির কাছে ধরা পড়েছে। যারা একদিন সত্য ছিল, তারা আজ চলে গেছে। তারা এখন স্মৃতিলোকের সামগ্রী। জীবন ক্ষণিক, সুখ মুহূর্তের। 'অর্কেস্ট্রা'র বক্তব্যও তাই, সেই কারণে হৈমন্তী'কে গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসেবে ধরা চলে।

'অর্কেস্ট্রা' প্রেমের কবিতার বই। তাই প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি এই গ্রন্থে তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। নৈরাশ্য-পীড়িত কবির চিত্তে প্রেমের সংবেদনে নিশ্চয়ই আশার রোশনাই জ্বলবে—এমন বিশ্বাস রাখাই ভালো। প্রেমিক কবি নিজেকে নায়ক হিসেবে অনুভব করে প্রেমিক-প্রেমিকার মানস-অনুভব ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার যে দর্শন শাশ্বত মহিমায় উদ্ভাসিত, কিংবা আরো পুরানো কালের বৈষ্ণব কাব্যে যে প্রেমমাহাত্ম্য—সুধীন্দ্রনাথের প্রেম কাব্যে

সে ধারণার বাষ্পমাত্র নেই, থাকার কথাও নয়। দেহকেন্দ্রিক চিন্তার উৎসারে তাঁর প্রেম-কাব্য অনুরঞ্জিত।

'অর্কেস্ট্রা'য় ২৫টি কবিতা আছে, প্রায় সবগুলিই প্রেমের কবিতা। এই কবিতাগুলির মধ্যে দেখা যাবে যে নায়ক চরম ভোগসর্বস্বতার শিখরে উঠে ক্লান্তি বোধ করছেন, এখন শুধু দৌর্বল্য-ভোগের বেদনা। দৈহিক ক্ষুধানিবারণে নায়ক এখন অশক্ত, পুনর্মিলনের আর আশা নেই। তবু তাঁর মনে হচ্ছে এখনো তিনি 'বুভুক্ষুদেহ'। সপ্তসিন্ধু পরপারের দূর প্রবাসিনী নায়িকার সঙ্গে তাঁর দৈহিক মিলনের যে রভসকেলির মত্ততা একদা ফেনিল ছিল, তারই উজ্জ্বল স্মরণ-দীপ্তিতেই নায়ক চমকিত; কবি হারানো সেই দিনকে ফিরে পেতে চান—

> অভ্যস্ত লজ্জার ছল, আচারের ব্যর্থ ব্যবধান
> ভৈরব রভসে হানি, যে-প্রেরণা ফুরাল নিমেষে,
> সীমাশূন্য অনন্তের ঘূর্ণ্যমান, ক্ষুব্ধ নিরুদ্দেশে
> আবার কখনও, প্রিয়ে, পাওয়া যাবে কি তার সন্ধান?
>
> সেই যে পাটল চাওয়া, সাঙ্গ লগ্নে বিস্ফারি নয়ান,
> নির্বাক কাকুতিটুকু পণ্ডশ্রম অন্তিম আশ্লেষে,
> অসম্পূর্ণ পরিচয় অসমাপ্ত দিবসের শেষে,
> সে সবের জন্য, জানি, স্মৃতির অমৃতে নেই স্থান॥

(পণ্ডশ্রম)

'অর্কেস্ট্রা'র অনেক কবিতাই দূরদেশিনী নায়িকার দেহ-সম্ভোগের স্মৃতি-রোমন্থন এবং স্মৃতি-আতুরতা মোহিনী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যৌবনে যে একদা উচ্ছল এবং উন্মত্ত আনন্দে কিছু মুখর দিন কেটেছে—তার স্মৃতি-উদ্বেল ফেনার কোমলতায় আজ কবি অন্ধ। কিন্তু স্মৃতি ত' ধূসর, বাস্তবতা থেকে সে যে পলায়নতৎপর। তাই কবির চিত্তে বিষণ্ণতার রেশ। এক সময় তিনি বসন্তমদির প্রকৃতির শ্যাম স্নিগ্ধতায় 'শ্লথনীবি কম্প্রদানে' নিজেকে নিঃশেষ করায় ব্যস্ত ছিলেন, 'শিথিল নীবিতে প্রগল্ভ পাণি'র

চপলতা উপলব্ধি করতেন, আজ বসন্তের সেই রঙ মুছে গেছে, রভসলীলাও নিঃশেষ হয়েছে, শুধু তার মর্মন্তুদ স্মৃতি নায়ককে পুড়িয়ে মারছে, কেন না নায়ক আজ আর নায়িকাকে চোখে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ 'সপ্তসিন্ধু-পরপারে অদর্শনে' তাঁর বসতি, নায়িকার কাছে নায়-কের বিদেশী নাম পর্যন্ত উচ্চারণে জিহ্বা আড়ষ্ট ঠেকে, নায়ক—

ভিক্ষুকের প্রায়,
উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা আহরিতে অধম ক্ষুধায় ;
সে আসে না স্তব্ধ অন্ধকারে,
সামান্য চোরের মতো, অজানার গুপ্ত অভিসারে।

(কস্মৈ দেবায়)

সপ্তসিন্ধু পারের বিদেশিনীর চটুল প্রেম, ক্ষণিকের আলিঙ্গন এখন আর উত্তাপ দেয় না, শুধু মনে পড়ে নায়িকা তার অতীত জীবনের কথা কেমন করে নায়কের কাছে ব্যক্ত করেছিল।

আজি মনে পড়ে
মুখর নদীর তটে, মর্মরিত দেওদারবনে,
কোনও এক নিদাঘের জনশূন্য দিনে
সদ্যস্নাত দেহ রাখি তৃণে,
বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী,
আপনার অতীত কাহিনী।

(সঞ্চয়)

নায়িকার রূপের ঝলক সাময়িক মোহের জাল বিস্তার করেছিল নায়কের চোখে ; তার পিঙ্গল চোখ, 'অসংবৃত কাপিশ অলক' কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তবু নায়িকার প্রেমে চিরন্তনতার আভাস তিনি দেখতে পান নি, দেহ-সম্ভোগের সার্থক সীমাতেই তা আবদ্ধ হয়ে আছে। দেহ কামনার ঊর্ধ্বে উঠে যে প্রেম শাশ্বত মহিমায় বীর্যবান ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তি পায় – সেই প্রেমের দ্যুতি বিদেশিনী নায়িকার নেই, ফলে কবির কাছে এই প্রেম যেমন নিষ্ঠাহীন, তেমনই ক্ষণিক ভোগের সামগ্রী।

সুধীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী, তাই ক্ষণিক ভোগের সামগ্রী সম্পর্কে তাঁর অনীহা নেই। নায়িকার মাধুর্য কবিকে পরিতৃপ্তি দেয় নি, তার প্রেম-নিবেদন কেমন যেন ছলনা বলে মনে হয়েছে, প্রেমকে কবির মনে হয়েছে ক্ষণ-বিলাসের বস্তু, এই সত্য অবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে 'অর্কেস্ট্রা'র 'মহা-সত্য' কবিতায়। সেখানে তিনি বলেছেন—প্রেমের স্মৃতি মানুষ চিরকাল লালন করতে পারে না, যৌবনের উদগ্র উত্তেজনারও অবসান ঘটে, দেহজ প্রেমের চিরন্তনতা থাকে না ; যৌবনের কামনা-কুটিল আকা-ঙ্ক্ষায় ভোগের মত্ততা অন্ধকারেই শেষ হয়, যৌবনের সেই উত্তেজনা সম্বরণ করা যায় না—কিন্তু তবু তার স্মৃতি শাশ্বত হয় না।

অসংগত চিরপ্রেম ; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায় ;
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্ত বন্যায়॥

(মহাসত্য)

যৌবনকালের মিলনে যে আনন্দ—তার তুলনা মেলা ভার, কিন্তু দেহজ তৃপ্তির অবশেষ কিছু থাকে না, ধ্বংসসার স্বপ্ন-স্তূপেই তার সমাধি, তবু স্মৃতির আরকে ক্ষণিক চিন্তার যে অবশেষ জমা থাকে—তা ত' অস্বী-কার করা যায় না, অমোঘ নিয়মে যখন জীবনের পাওনার পর শেষের পরোয়ানা জারি হবে, তখন মৃত্যুর হিসাবে রূপোন্মাদ যৌবনের উত্তে-জনা—যাকে কবি ভ্রান্তি বলে মনে করেছিলেন—শুধু মনে পড়ে যাবে-জীবনের পক্ষে তখন তাকেই মহাসত্য বলে মনে হবে।

'অর্কেস্ট্রা' কবিতা পড়ে মনে হতে পারে কবির জীবন-চেতনা নঞর্থক, এবং এই নেতিবাদী জীবনচৈতন্য থেকেই বুঝি তাঁর ক্ষণবাদী মনো-ভাবের জন্ম। তিনি যথার্থই বিশ্বাস করেছেন—

মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা
যাতনা শুধুই যাতনা সুচির সাথী।

এই চেতনা শুধু 'অর্কেস্ট্রা'-তে নয়, মৃত্যুর অমোঘতা সম্পর্কে তিনি 'উত্তরফাল্গুনী'তেও একই রকমের কথা ব্যক্ত করেছেন—

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে।

(দ্বন্দ্ব)

জীবন-চেতনা যতই নঞর্থক হোক, তবু এর ক্ষণিক মায়ায় মানুষ মুগ্ধ হয়, ক্ষণিকের আনন্দে সে মগ্ন হতে দ্বিধা করে না, এই শান্তিই তখন তার কাছে কাম্য হয়।

'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী' থেকেই স্মৃতিচারণার বিষণ্ণ আবহাওয়া শুরু হয়েছে, এবং স্মৃতি-অনুধ্যানের সমগ্র পর্বেই বিষাদের ছোঁয়া ও রিক্ততার প্রচ্ছন্ন আর্তি থেকে গেছে। সম্ভোগ সুখের স্বল্প-লীলা মুহূর্তেই অবসিত হয়—তাই তাঁর নায়িকা ক্ষণিকা, তাঁদের প্রেমও ক্ষণিক—

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার ঃ
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার ;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ॥

(হৈমন্তী)

দেহমিলনের আনন্দ সাময়িক, তাৎক্ষণিক উন্মাদনা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়, প্রেমের উচ্ছ্বাস ক্ষণিক, ক্ষণবাদী তাঁর মানসিকতায় নায়িকাও তাই ক্ষণিকা।

প্রেমের সম্ভোগে জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় নি, প্রেমের ফসল হিসেবে এমন কিছুই তাঁর প্রাপ্তি ঘটলো না—যা দিয়ে তিনি জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে পারেন ; তাই তিনি প্রেমকে জীবনের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে ব্যক্ত করতে পারলেন না, কেমন এক নেতি-চৈতন্যের শূন্যতায় তার মন ভরে উঠেছে।

জানি তবু
তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে
মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু ;

অবলুপ্ত অতল অভাবে,
তোমার অজস্র দান
বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।
নিভৃত নিশীথে
নীরব আকাঙ্ক্ষা-ভরে এসেছিলে বাসর শয্যায় ;
ত্রস্ত অলজ্জায়
চেয়ে ছিলে অযাচিত উপহার দিতে
অনুপম কৌমার্য তোমার।

(কস্মৈ দেবায়)

কবির কাছে নিষ্ঠান্বিত, সাধনালব্ধ প্রেমের কোনো প্রতিভাস নেই, শাশ্বত প্রেমের প্রতিবেদন তাঁর কাছে মিথ্যা, অঙ্গীকার অর্থহীন। প্রেমের প্রতিশ্রুতিকে তিনি 'দয়ার্দ্র বঞ্চনা' বা 'নির্বোধ বিদ্রূপ' বলেছেন, তাঁর কাছে দেহ সম্ভোগই প্রেমের চরম প্রাপ্তি ও পরম অবশেষ বলে মনে হয়েছে, নায়ক-নায়িকার ক্ষণিক আশ্লেষের তৃপ্তি ক্ষণপরেই বিলীন হয়, একে তখন অপরের কাছ থেকে বিদায় মাগে—

বিদায়, বিদায়, তবে চিরতরে বিদায়, সজনী ;
সমাপ্ত সুকৃতি আজি, স্বর্গচ্যুতি আসন্ন আমার ॥

(ভবিতব্য)

এই নায়িকার চতুরালির কথা স্মরণ করেও নায়কের বলতে দ্বিধা নেই—

ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফলে,
তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর ;
যে-হস্ত নিবদ্ধ এবে মোর ভুজে প্রাণপণ বলে,
রচিবে বরণমাল্য বারংবার সে-নিষ্কম্প্র কর ॥

(তদেব)

এই লীলাসঙ্গিনী নায়িকা বিদেশিনী, তার প্রেমকে কবি চিরকালীন বলে ভাবতে পারেন নি। নায়িকা নিজেই কবিকে বলেছিল—

বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী,
আপনার অতীত কাহিনী।
উপেক্ষি মিনতি,
হানি মোর চুম্বনে বিরতি,
বলেছিলে সে-নিকুঞ্জে কী মহার্ঘ দান
পেয়েছে তোমার কাছে মোর পূর্বে কত ভাগ্যবান॥

(সঞ্চয়)

কবির তাতে ক্ষোভ নেই ; বিদেশিনীর প্রেম দেহ-সম্ভোগেই সার্থক সীমায় পেঁৗছেছে। অমল পদ্মের প্রতীক যে প্রেম, দেহ কামনার ঊর্ধ্বে উঠে যে প্রেম শাশ্বত মহিমায় বীর্যবান ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তি পায়—সেই প্রেমের দ্যুতি বিদেশিনীর নেই, ফলে কবির কাছে এই প্রেম নিষ্ঠাহীন বলে মনে হয়েছে।

স্মৃতি রোমন্থন 'অর্কেস্ট্রার' সর্বত্র। 'চপলা' কবিতাতে স্মৃতির কথা মুখ্য হয়েছে। এখানেও নায়িকা বিদেশিনী। তার লজ্জারাঙা মুখের কথা কবির মনে পড়েছে। ভোগতৃপ্ত বাসনার কথাও স্মরণপথে উদিত হয়েছে, নায়িকার প্রেমে আপ্লুত কবি ; নায়িকার মাধ্যমেই তার জগৎ সম্পর্কের যা-কিছু বোধ। সেই নারী আজ দূরে চলে গেছে, তারই স্মৃতি-কীট কুরে কুরে বুঝি বক্ষ চিরে খেতে বসেছে। একটু বেদনা, একটু নৈরাশ্যের মধ্যেই কবির সে সব কথা মনে পড়ছে। এই নারীর সৌন্দর্যে কবির মোহমুগ্ধ মন লুব্ধ হয়েছিল—

তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারি তনুর মদিরা ভরা ;
পথ পার্শ্বের অপরাজিতা, সে
তোমারই দৃষ্টি লক্ষ্যহরা॥

(চপলা)

কিন্তু এই সৌন্দর্য ক্ষণিক আনন্দের উৎস, কারণ নায়িকার প্রেমে চির-দিনের আনন্দের কোনো ঠিকানা নেই। কবি বলছেন—

চির জনমের প্রবঞ্চনার
ক্ষালনে আজি কি ছলনাময়ী,
চিতসঞ্চিত অমৃত বিতরি,
করিবে আমারে মরণজয়ী ?
অথবা আবার খামখা খেয়ালে
অন্ধেরে ঘিরে মমতার জালে,
সন্ধিপূজার ষোড়শোপচার
রচাবে কেবলই শূন্য পীঠে ?
অমর হাসির বজ্রদাহনে
জ্বালাবে লোলুপ মর্ত্যকীটে ?

(তদেব)

তাই প্রেয়সীর কাছে কবির জিজ্ঞাসা—এখনো কি প্রথম বাঙ্ময় রজনী, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা, প্রতিজ্ঞার আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা নায়িকার মনে পড়ে ?

প্রেয়সী, আছে কি মনে সে-প্রথম বাঙ্ময় রজনী,
ফেনিল মদিরা-মত্ত জনতার উল্বণ উল্লাস,
বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস,
অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি ?

(অপচয়)

নায়িকার স্মৃতিই আজ নায়কের একমাত্র সম্বল, নায়িকাকে স্মরণই শুধু সত্য। নায়কের জাগর স্বপ্নলোকে নায়িকা একমাত্র সত্তা, নায়িকাকে মরীচিকা বলে জানা হয়ে গেছে—তার সঙ্গে কবির প্রাণ-বিনিময় কোনও দিন হবে না। নায়িকার প্রেম নিবেদনেও কবি নিজে ধরা দেন নি, প্রেমের সঙ্গেও ছলনা করেছিলেন, সম্ভোগ-লীলার উদগ্র

উচ্ছ্বাসেই প্রেমিকের ভূমিকাটুকু পালন করেছেন মাত্র—

আপনারে ছলি,
পশিনি তোমার মর্মে, নিজের গহনে
জমায়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল।
জানি কত তরুণীর গাল
অমনই অধৈর্যভরে শতবার দিয়েছি রাঙায়ে,
অনুপূর্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে। ক্রমাগত
তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে, ধারাপাতে, ঝড়ে ;
যুগান্তরে
তোমার স্মৃতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধুলায়॥

(নাম)

আজ স্মৃতি-কীটের তাড়নায় কবি সেই প্রেমিকাকেই অভীপ্সিত ভাবছেন, সেই নায়িকার নামই আজ তিনি জপ করেছেন—

অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম॥

(নাম)

'অর্কেস্ট্রা'র সবগুলিই প্রেমের কবিতা, তবু বক্তব্যে এবং সেই বক্তব্য উপস্থাপনের ভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য আছে।

'অনুষঙ্গ' কবিতায় কবি নতুনভাবে প্রেমের অনুভব প্রকাশ করেছেন। ক্ষণবাদী সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রেমের চিরন্তন আশীর্বাদ তেমন উজ্জ্বল নয়, কিন্তু 'অনুষঙ্গ' কবিতার আরম্ভে ক্ষণিক প্রেমের দেহসর্বস্বতার ফেনাটুকু যেমন বর্ণিত হয়েছে, শেষ দিকে ক্ষণিক প্রেমের অপার মাধুর্যের একটি আনন্দোদ্বেল সুতৃপ্তির কথা রয়েছে। নৈরাশ্যবাদী এই কবির বহু কবিতায় যেমন রিক্ত মরুর চিত্র, ফণিমনসার কণ্টকিত ধূসরতা—'অনুষঙ্গ' কবিতাতেও সেই ম্যানারিজম থেকে মুক্তি নেই।

প্রেমে যে অনির্বচনীয় প্রশান্তি, সুধীন্দ্রনাথের দেহনির্ভর ভোগসর্বস্ব প্রণয়ে সেই লোকাতীত তন্ময়তা নেই, ফাল্গুনী তাঁর কাছে অপসৃত, তাঁর কাছে নন্দনের প্রতিশ্রুতি 'ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া-সম'। তবু কবি দেহাতীত প্রেমের স্পর্শলাভে উন্মুখ হয়েছিলেন, হোক তা মুহূর্তের জন্যে—তবু প্রেমের চিরন্তন আবেগে স্বর্গের সুষমা যে ঝরে, সে প্রত্যয়ও তাঁর চিত্তে উপস্থাপিত হয়েছে—

জানিনা একদা কেন ভালোবেসেছিলাম তোমারে।
শুধু জানি শিখালে মদির অন্ধকারে
অমৃত মর্ত্যেরই দান, স্বল্পপ্রাণ প্রমোদের কণা
আহরি, জন্মান্ধ করে ভূমাবিরচনা।
জানি, আরও জানি
তোমার ক্ষণিক প্রেমই অস্তিমের অব্যয় পারানি ;
উপরন্তু ধরা,
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দরা॥

(অনুষঙ্গ)

'মহাশ্বেতা' কবিতায় রোমান্টিক কল্পনা অকৃপণ হয়ে দেখা দিয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকার মতোই তার রূপসজ্জা, প্রকৃতিও উপযুক্ত সৌন্দর্যে উপস্থিত :

একদিন
পুলকি অপরিচিত নদীর পুলিন
তাপতাম্র এমনই নিদাঘে,
যে অপূর্ব জপমন্ত্র কানে মোর নিবিড় সোহাগে
দিয়েছিল সুন্দরের দূতী,
ভ'রে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি
সে-প্রণাদ অনুলাপে ;
বক্ষে কাঁপে
কী এক বচনাতীত, তীব্র সংবেদন ;

সপ্তসিন্ধুপারে বিচঞ্চল নারিকেল বন
মৃদুল মর্মরে
সহসা সম্পূর্ণ করে
অসমাপ্ত পরিচয় তার ॥

(মহাশ্বেতা)

তবু সেই পরমা নায়িকা 'ক্ষণিকা'—যদিও পত্রে, পুষ্পে তারই উপমা, সমস্ত ভুবন জুড়ে যদিও তার উপস্থিতির আভাস, তবু সেই ক্ষণিকা রমণীর স্মৃতির স্বর্গ কবির কাছে কোনোদিন লুপ্ত হবে না, প্রেমের স্মৃতি ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকারের মতোই চিরকাল কবির কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

প্রেমের এই অক্ষয় চেতনা এবং নায়িকার উপমান হিসাবে প্রকৃতিকে উপস্থাপনা 'শাশ্বতী' কবিতায় আরো উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে। অবশ্য এই কবিতার অনেক পঙক্তিতেই সংস্কৃত কাব্যের অনুরণন শোনা যাবে। বর্ষা শেষের প্রকৃতি, শরতের আগমনী-আনন্দে ধ্বনিত হচ্ছে, প্রকৃতির এই প্রগল্‌ভ সময়ের অপূর্ব বর্ণনায় কবিতাটির শুরু, কিন্তু পরক্ষণেই কবি 'অর্কেস্ট্রা'র মূল সুরের সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে ঘোষণা করলেন—

একদা এমন বাদল শেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিন এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত চিঠির মানে।

(শাশ্বতী)

স্মৃতি-রোমন্থনতার আর্তিই ফুটে উঠলো। তবু প্রকৃতির এই শারদীয়

আয়োজনে নায়িকা বুঝিবা মূর্তিলাভ করেছে। শরতের নদীকে কবির মনে হয়—তাঁর নায়িকার আবেগেরই বুঝি প্রতিনিধি, আজকের অমল আকাশে তারই হৃদয় মুকুরিত, 'স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যাভিষেকে।'

স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম।

(শাশ্বতী)

প্রকৃতির সঙ্গে মানবীয় এই লগ্নীভবন সাহিত্যে হয়তো নতুন নয়, কিন্তু আধুনিক কবির পক্ষে প্রাচীন সংস্কৃত কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের এই প্রকরণে আশ্রয় নেওয়া যেমন সাহসী সঞ্চরণ, তেমনই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ অভিব্যক্তি।

কিন্তু কবিতাটির শেষে ক্ষণিক মিলনের স্মৃতির আর্তি ও বেদনাই প্রাধান্যলাভ করেছে। বিগত দিনের সেই নায়িকা আজ প্রকৃতিলীনা হয়েও নায়কের প্রতি অনীহাপ্রবণ, সে অনায়াসেই নায়ককে ভুলে বসে আছে, কিন্তু নায়ক তাকে চিরকাল মনে রাখবে—কারণ সে যে চির-কালীন, শাশ্বতী, তাকে ভোলা যাবে না।

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুষ্পিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না॥

(শাশ্বতী)

'অর্কেস্ট্রা'র কবিতাগুলিতে রিক্ততা বিষণ্ণতা এবং ক্ষণভঙ্গুরতার ছাপ থাকায় কবিতাগুলির রোমান্টিক চপল চঞ্চল চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় না, কবি তাঁর স্মৃতি-আতুর বেদনাপীড়িত চিত্তের রিক্ততার রীড টিপেছেন—ফলে শ্রান্তক্লান্ত মন্থরতার একটা প্রলেপ পড়েছে। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ অতি তরল ও অতি শিথিল প্রকরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন,

বস্তুত চটুল এবং আবেগ-এলায়িত কাব্যরীতির বিরুদ্ধেই তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন জেহাদ ছিল, তাই তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে চপলতা স্থান পায় নি। প্রেমের বিবিধ ভাবপ্রকাশে বা রঙ্গ-রসিকতার হাল্কা মেজাজে বিগলিত তিনি হন নি—শুধু 'অর্কেস্ট্রা'য় নয়, তাঁর কবিসত্তার সামগ্রিক চেহারায় কোথাও তাঁকে তারল্যের সঙ্গে সন্ধি করতে দেখা যায় নি।

এর আগে বলা হয়েছে যে কবিতার মুখ্য উপাদান হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতাকেই বিশেষভাবে গণ্য করতেন, এবং অভিজ্ঞতাকেই উপযুক্ত ভাষায় চারুত্বমণ্ডিত করে কাব্যায়িত করাতেই তিনি প্রয়াসী ছিলেন। 'অর্কেস্ট্রা'র বহু কবিতাতে তাঁর অভিজ্ঞতারই বাঙ্ময় রূপায়ণ দেখা গেল। আর সেই সব অভিজ্ঞতা স্মৃতিরোমন্থনের চেহারা নিয়ে কবিতায় এলো।

গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক কবিতারই অংশ বিশেষ তুলে দেখানো যায়—কবির স্মৃতিলীন অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত উপলব্ধিলোক তাঁর ভাষার যাদুতে কাব্যায়িত হয়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ব্যক্ত করার জন্যে তিনি কঠোর অনুশীলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, অভিজ্ঞতাকে কাব্যধর্মে দীক্ষিত করতে যে কঠোর অনুশীলন করতে হবে—একথা জোরের সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে—'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাব্যগত অভিজ্ঞতা এক নয়, প্রথম যেখানে সারা, সেখানেই দ্বিতীয়ের শুরু।' তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে অভিজ্ঞার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞাই কাব্যত্বে উন্নীত হয়েছে। শুধু 'অর্কেস্ট্রা'য় নয়, সব গ্রন্থেই তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাতেই তাঁর নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, কবিতাকে তিনি যেমন ভেবেছেন, যেমন করে তিনি রাবীন্দ্রিক সাম্রাজ্য থেকে সরে এসে নিজের একটি স্বকীয় এলাকা চিহ্নিত করেছেন, সর্বত্র তিনি তেমন করেই ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে কঠোরভাবে অনুশীলিত করে কাব্যত্বে উন্নীত করেছেন, এই জন্যেই বলা যায় যে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে সুধীন্দ্রীয় চরিত্রের একটা গৌরব দীপ্ত হয়ে উঠেছে—এবং এই জন্যেই

তাঁর কবিতার সর্বত্র তাঁর নিজস্বতার ছাপ রয়েছে ; সেই কাব্য-চরিত্র ভালো লাগুক কি মন্দ লাগুক, সেটা পাঠকের ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কাব্য সৃষ্টিতে তাঁর এই বাড়তি বাহাদুরি কারুরই দৃষ্টি এড়াবে না।

এবার 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করে এই পর্ব শেষ করি। একদা-প্রেয়সী যে নারী তারই স্মৃতিতে কবি আজ উদাস, বেদনা-ভারাতুর, সপ্তসিন্ধুপারে ফিরে এসে ভোগক্লান্ত অবসন্নতায় নায়িকার সঙ্গে তাঁর বিচিত্র বিলাসের স্মৃতির কথাই মনে পড়ছে—নায়িকাও বহুবল্লভা, নায়ক তার পরিচয় পেয়েছেন, তাই নায়িকার প্রেম যে ক্ষণ মিলনের বৈদ্যুতিক উতল উল্লাসেই সমাপ্ত—এ সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা বা সংশয় নেই। কবির মনে আজ স্মৃতির তন্ত্রীতে বিবিধ সুরের সমন্বিত তাল লয়ের সমীকৃত ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে, প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতা, রভস-লীলার সাময়িক উল্লাস, আনন্দের চপল স্পর্শ, আশ্লেষ ও আলিঙ্গনের উষ্ণ অথচ ক্ষণিক শিহরণ—কবির স্মৃতিলোকে যে বিচিত্র বোধের বেদনা-বাহিত সুর বাজাচ্ছে, কবি 'অর্কেস্ট্রা'য় তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন—তাই এই গ্রন্থের হেন নাম। সুধীন্দ্রনাথেরও ইঙ্গিত এই মর্মে : "বাংলা কবিতার পদলালিত্য এ গ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত ; এবং এতে রোমাণ্টিক সৌন্দর্য বোধের ব্যবহার বিরূপ বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।

বুঝিবা সেই জন্যে যে-সংগতি পাশ্চাত্ত্য সিম্ফনিক্ সঙ্গীতের প্রধান লক্ষ্য, তার ইঙ্গিতও 'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম সমালোচকেরা নাম কবিতায় খুঁজে পায় নি ; তাঁদের মন্তব্যে যদিচ সাঙ্গীতিক সামঞ্জস্যের সঙ্গে মানসিক নির্দ্বন্দ্বের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত দেখি না, তবু আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে মানি যে সার্থক কবিতা যে-অমায়িক অভিজ্ঞার অমোঘ অভিব্যক্তি, তার আভাসসুদ্ধ পরবর্তী রচনাগুলোর একটাতেও নেই। কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা'-অভিধেয় বহুরূপী লেখাটা, বাক্যের অসহযোগ সত্ত্বেও, কায়-মনের সপ্তপদী ; এবং তার সাতকাণ্ড যেমন গতিমূলক পরাকাষ্ঠার সোপান-পরম্পরা, তেমনই প্রত্যেক পর্ব আবার ত্রিবিধ

উপলব্ধির তাৎকালিক সমন্বয়। অর্থাৎ প্রতিভাগে ঘুরে ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ ; এবং সমগ্র কবিতার ত্রিবেণীতে একদিনের সাত প্রহরব্যাপী অভিজ্ঞতাই কৈবল্যপ্রার্থী নয়, তাতে—সম্ভবত গ্রন্থের অন্যত্রও—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরাত্মার, তথা লোকায়ত ও লোকোত্তরের, অবৈকল্যও অন্তত উহ্য আছে।" (ভূমিকা, অর্কেস্ট্রা)

ক্রন্দসী

'অর্কেস্ট্রা'য় যেমন প্রেম ও প্রেমের স্বর্গচ্যুতি, ভোগসর্বস্বতা এবং সম্ভোগ সমাপনান্তিক স্মৃতিচারণার কথা আছে, 'ক্রন্দসী'র কবিতাবলীতে তেমন একমুখী সংবেদনের প্রকাশ ঘটে নি। কবি যখন যেমন মেজাজে ছিলেন, তখন তেমন কবিতা লিখেছেন—বিষয়ানুক্রমে সেই কবিতাগুলিকে গ্রন্থে সাজান নি বা এক বিষয়ের কবিতা একটি বইতে দিয়ে বাকীগুলি গ্রন্থান্তরে দিয়ে তিনি কবিতার বইয়ের পর্ব ভাগ করেন নি। সুধীন্দ্রনাথের রচনা অত্যন্ত স্বল্প, সওয়া একশোর কিছু বেশী মৌলিক কবিতা তিনি লিখেছেন, আর ৫৫টি অনূদিত কবিতা আছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা হলো সাতটি। অনূদিত কবিতাগুলি 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্থে আছে—সেখানে একটি নীতির নিরিখ আছে। কিন্তু অন্য কোনো বইতে—এমনকি 'অর্কেস্ট্রা'য়--যা মূলতঃ প্রেমের কবিতার বই—বিষয়ানুক্রম খুব বেশী রক্ষিত হয় নি ; 'ক্রন্দসী'তে ত' নয়ই। রচনার কালানুক্রম ধরে গেলে তাঁর কবিতাগুলির গ্রন্থভুক্তির কারণ তবু খুঁজে পাওয়া যাবে।

১৯২৯-৩১ সালের লেখা কবিতার বেশীর ভাগ আছে 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থে, এমন কি প্রেম বিষয়ক দু একটি কবিতা—যা ১৯৩২ সালে রচিত হয়েছে—তার দু একটিও 'অর্কেস্ট্রা'য় আছে। 'ক্রন্দসী'তে ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালের লেখা কবিতাই বেশী, তবু ১৯৩১ সালে রচিত 'প্রত্যাখ্যান' এবং ১৯২৮ সালে লেখা গোটা চারেক কবিতার স্থান এই গ্রন্থে হয়েছে।

'ক্রন্দসী'র অতি বিখ্যাত কবিতা হলো 'উটপাখী'—এটি দিয়েই গ্রন্থারম্ভ। সুধীন্দ্রনাথ জীবনের শূন্যতাকে বোঝাতে মরুভূমির রিক্ততাকে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যের একরূপতা নিয়ে আলোচনার

সময় মরুভূমির চিত্রকল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা বলেছি। 'ক্রন্দসী'র প্রথম কবিতাতেই তিনি বন্ধ্যাজীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে মরুভূমি এবং মরীচিকার কথা ব্যক্ত করেছেন। নেতিবাচক মনোভাবেরই ফসল এই কবিতাটি, জীবন এখানে নঞর্থক, তাই বন্ধ্যা মরুময় প্রান্তরে অসহায় উটপাখীর বিচরণের ছবি এঁকে কবি তা বুঝিয়েছেন। এই কবিতাটির ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচক মহলে কিছুটা মত পার্থক্য আছে। এটিকে অনেকেই মধ্যবিত্ত মানুষের নৈরাশ্যপীড়িত মানসের বোধ নিয়ে লেখা কবিতা বলেছেন, কেউ কেউ এই কবিতাটিকে সুররিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তব বলেও ইঙ্গিত করেছেন—অবশ্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন নি। তবে পরাবাস্তব বা অধিবাস্তব—যাই বলা হোক না কেন, 'উটপাখী' কবিতাটি যে প্রতীক কবিতা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবে উটপাখী যে ঠিক কার প্রতীক—তার সঠিক নির্দেশ দেওয়ার মুস্কিল আছে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সুধীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বহু পঠিত এবং বহুভাবে উল্লিখিত, কিন্তু বিশেষভাবে আলোচিত নয়। 'বনলতা সেনে'র উল্লেখ যেমন জীবনানন্দীয়, 'উটপাখী'র উল্লেখ তেমনই সৌধীন্দ্রিক বা সুধীন্দ্রনাথীয়।

মধ্যবিত্ত মানসকে সুধীন্দ্রনাথ উটপাখীর মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন—"নিষ্ফলা যুগের মানুষকে এলিয়ট Hollw Men আখ্যা দিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাদের দেখেছেন উটপাখীর চিত্রকল্পে। যুগের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হয়ে গেছে, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত উটপাখীর মতোই সে রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হতে চায় না, বরং বালিতে মুখ গুঁজে তাকেই সযত্নে রাখবার চেষ্টা করে"—(আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী)। কিন্তু গোটা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এই জাতীয় একটা অর্থ ব্যঞ্জিত হয়েছে মনে করারও কিছু মুস্কিল আছে। কবিতাকে টুকরো টুকরো করে অপারেশনের মাধ্যমে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী মেধার সাহায্যে বোঝার কথা স্বীকার করে নিয়েও নিবেদন করতে পারি যে মধ্যবিত্ত মানসকে উটপাখীর মাধ্যমে

উপস্থাপিত করা যদি হয়, তবে রূপকের আধিকারিক প্রয়োগের জন্যে সমগ্র কবিতায় সেই ব্যঞ্জনার সঞ্চার থাকে নি। একই কবিতার কত-কাংশ একভাবে, অপরাংশ সুবিধাজনক অর্থে অন্যভাবে গ্রহণ করায় অসুবিধা হয় নাকি ? তাতে কবি যে রূপকার্থ ব্যবহার করেন—তাঁর মাহাত্ম্যকে খর্ব করা হয় কিনা— সেই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে !

মরুভূমি সুধীন্দ্রনাথের প্রিয় চিত্রকল্প--নৈরাশ্যের ও ধূসরতার সঙ্গে এই ছবির সঙ্গতি আছে। মধ্যবিত্তের সংসার মরুভূমির মতোই দুস্তর, নৈরাশ্যের মধ্যে দুঃসহ অভিযাত্রার অসহায় পরিক্রমার ক্ষেত্র। সেই কারণে তিনি মধ্যবিত্ত মানসকে মরুক্ষেত্রের উটপাখী ভাবতে পারেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ। বিশ্বের বিরূপতায় তিনি কাতর হয়েছেন, ভিড়ে ভরা এই বিশাল পৃথিবীতে তাঁর মনে একাকীত্বের বেদনা বেজেছে, সেই একক মানুষ অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকাকে বিড়ম্বনা ভাবতে পারে। সমাজ এবং সংসারে মেল-বন্ধনের প্রয়াসও তাঁর কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না ; বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকী মানুষের অসহায় আত্মা সমাধানের পথে ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেঁ ছিতে পারে নি, চতুর্দিকেই সে নৈরাশ্যের ছায়া দেখতে পায়---তাকে উদ্দেশ্য করেও কবির এই উক্তি---

কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥ (উটপাখী)

সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডিকে মহিমান্বিত রূপে দেখে সেই ট্র্যাজেডির নায়ক সেজেছেন, তাঁর নৈরাশ্যে, নিঃসঙ্গতায়, বেদনাবোধে, জীবনচেতনায়, যুগধর্মের আঘাত-সংঘাতে—এমন কি ব্যক্তিগত প্রেমের অবসানে ভোগক্লান্ত দুর্বল দেহীরূপে স্মৃতি রোমন্থনের ভারাতুর সংরাগে—সর্বত্র তিনি ট্র্যাজিক নায়কের উচ্চশির ব্যক্তিত্বের মহিমায় দাঁড়াতে ভালবেসেছেন, সেই নায়কের মনোবেদনায় অসহায় উপলব্ধির দিক থেকেও উটপাখী কবিতাটির একটি সরল রূপকার্থ করা যায়। সেই নায়ক নিয়তি-নিহত, সে আর কোথায় পালাবে। তার একাকীত্ব নিয়েই তাকে অপমৃত হতে হবে।

'ক্রন্দসী'তে নানা ধরনের কবিতা আছে, প্রেমের, ঈশ্বরচিন্তার, মৃত্যু-ভাবনার, এমনকি পশুপক্ষীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের, বাস্তব রসের, সব রকমের কবিতা আছে। প্রেমের কবিতাগুলিতে 'অর্কেস্ট্রা'র সুরের অনুবর্তন ; 'চপলা' কবিতায় কবি তাঁর জন্মজন্মান্তরের নায়িকাকে বিদেশিনীর নীল নয়নের আয়ত সাগরে প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছিলেন, সেই সুরের পরিপূরক হিসেবে ধ্বনিত হয়েছে 'জাতিস্মর' কবিতা।

'নরক' একটি বিখ্যাত কবিতা, নৈরাশ্য এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ মানসের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কবিতাটির আলোচনা করেছি। যুগের ক্রম-ক্ষীয়মাণ বেদনায় কবি মর্মাহত। তদুপরি তাঁর কাছে প্রেমের চরম সার্থকতা দেহগত আনন্দের মধ্যে, সীমাবদ্ধ তার বাইরে প্রেমের আর কোনো আবেদন নেই, কিন্তু দৈহিক সান্নিধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে নৈরাশ্যের অন্ধকার নামে।

'সন্ধান' কবির আত্মানুসন্ধানের সাক্ষ্য বহন করছে। নিজের যথার্থ সত্তাকে তিনি খোঁজ করতে চান। নিজের ভেতর কবি এমন এক বোধিকে খোঁজ করায় রত—যা ব্যবহারিক সত্তায় অধিষ্ঠিত নয়—

> আপনারে অহরহ খুঁজি।
> কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রম্ভালাপ বুঝি,
> অন্বিষ্ট সে নয়। (সন্ধান)

অমল চৈতন্যের নির্বিকার রূপই তাঁর অন্বিষ্ট। তিনি শুধু খোঁজ করেই চলেছেন। তিনি যাকে চান—তার মধ্যে ভেদ নেই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই, দেশ-কালের আড়াল নেই—

মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে
একান্ত সে ; বিসংবাদী উপাদান শিল্পের শুদ্ধিতে
যেমন নিষ্ফল, সেও তেমনই সংগত—
সংকল্পপ্রহত
বাদ্যভাণ্ড মগ্ন ঐকতানে। (তদেব)

তাঁর এই অনুসন্ধানের বা অভীপ্সার বস্তু হচ্ছে বোধি বা চৈতন্য। সেই আকাঙ্ক্ষিত চৈতন্যকে তিনি বটবৃক্ষের প্রতীকে বর্ণনা করেছেন, কেননা এই চৈতন্যলাভ করলে নিরাশ্রয় মানুষের মনে একটা ছায়ানীড় মিলতে পারে।

অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাগে
বিকশিত আশুক্লান্ত নির্বিশেষ ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে॥

(তদেব)

'লঘিমা' শীর্ষক কবিতাতেও আত্মগত সংবেদনের কথা আছে। আত্মানু-সন্ধানের অনুরূপের কথাই অন্যভাবে বলা হয়েছে। কবি নিজের স্বার্থ-পর স্বরূপকে উপলব্ধি করে ব্যথিত হন, নিজের অমৃতসন্ধিৎসু সত্তার বুঝি অপমৃত্যু ঘটেছে—

মনে হয় স্বার্থপর, অকিঞ্চন, উঞ্ছজীবী আমি,
আমার ইতর লোভে অমৃতবঞ্চিত অন্তর্যামী
বুভুক্ষায় মরে আজ ; মনে হয় এ-ক্ষুধার পাশে
তুচ্ছ মোর চাওয়া-পাওয়া ; বিচঞ্চল অসীম আকাশে
বিকীর্ণ যে-সর্বনাশা, তার মাঝে হারায় হঠাৎ
মোর উল্লাসের অর্থ।

(লঘিমা)

কবি নৈরাশ্যের অন্ধকারে নাস্তিগর্ভ প্রাক্তন তিমিরে নিমজ্জিত হন, তাঁর স্বতন্ত্র সত্তার অবলুপ্তি ঘটে!

এক বিশেষ কারণে 'সৃষ্টিরহস্য' কবিতাটি আমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ নৈরাশ্যপীড়িত ক্ষণবাদী, শূন্যতা এবং অন্ধকারেই তাঁর বিচরণ, তাঁর সামনে নিখিল নাস্তির হাতছানি। কিন্তু তিনি তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত মনেও ভেবেছিলেন—কেন এই শূন্যতা, এবং এই শূন্যতাই কি চরম শেষ কথা, সে প্রশ্ন তাঁর মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিত। সেই প্রশ্নের সূত্রসন্ধান এই 'সৃষ্টি-রহস্য' কবিতায় আছে। তিনি 'স্বগত' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—"দিনে দিনে নিজেকে যত চিনেছি, তত বুঝেছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল।" মৃত্যুর কয়েক বছর আগের এই লেখায় কবির আন্তরিকতার প্রতি কোনো সন্দেহ জাগে না, এবং তাঁর মনেও পৃথিবীর এক আস্তিক রূপের এবং সংসার বা সমাজ-জীবনের এক সুকুমার দিকের চিন্তা সুপ্ত ছিল—বোঝা যায়। এই চিন্তা তাঁর অবচেতন মনে বহুদিন থেকেই শিকড় বিছিয়েছে। সেই অবচেতনার উৎস থেকে উপজাত চিন্তার ফসল হলো এই 'সৃষ্টি রহস্য' কবিতা—যেখানে কবি নিখিল নাস্তির বিশ্বে দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করেছেন—মহাশূন্য কি সত্যই শূন্য নয়?

> তবে কি দুর্মর মর্ত্য ক্রন্দসীতে ক্রন্দন বিথারে;
> শস্যের মিসরী শবে উপ্ত সম্ভাবনার সঙ্কেত? (সৃষ্টি রহস্য)

দূর থেকে মহাশূন্যের নীহারিকাকে নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত মনে হয়,—'কালের প্রপাতে মগ্ন বাসনার ভাসমান ফেনা' যেন। কবির প্রত্যয়ে এই বিশেষ সুর শোনা গেল—

> নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ;
> নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয়
> হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয়;
> জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ॥

কপোল কল্পনা ত্যাগ ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন ;
অনন্ত প্রস্থান মিথ্যা ; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই ; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন ॥

(তদেব)

'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় কবি রোমান্টিক স্বপ্নবিহ্বলতাকে ত্যাগ করতে ব্রতী হয়েছেন, পৃথিবীর বাস্তব দুর্দশায় তাঁর চিত্ত বিহ্বল—তার প্রতি-বিধানের জন্যে তিনি অক্ষম বেদনায় কাতর হয়ে পড়েন, তাই রোমা-ন্টিক বৃত্তিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, মিথ্যার বেসাতি আর নয়; তাঁর ঘোষণা :

পরাব না সভ্যতার শ্লীল ছদ্মবেশ ;
ঢাকিবারে গলিত শবের গন্ধ
রজনীগন্ধার গুল্ম করিব না শ্মশানে রোপণ।

(প্রত্যাখ্যান)

ঈশ্বরের কাছেও তিনি অভিযোগ তুলেছেন—অত্যাচারীর শাস্তি তিনি কেন বিধান করছেন না, দুঃশাসনের দলকে কি তিনি ভুলে গেছেন ?

'বর্ষশেষ' শূন্যতা ও নৈরাশ্যের কবিতা ; হতাশা বেদনা ও আত্মগ্লানির অন্ধকারে যখন কবি-মন মৃত্যুমুখী, তখন পীত-লোহিত গুলমোর ফুল ফুটিয়ে প্রকৃতি যে শান্তির প্রলেপ পাঠিয়েছে কবির অন্তরে—তার আকস্মিক উপলব্ধি ঘটলো। এ কিসের অনুরাগ ? একি ক্ষণিক শান্তির ও সুখের স্বপ্নস্বরূপ ?
এমন অসার স্বপ্নস্বরূপ হয়ে রয়েছে গত বছরের শুকনো মালাখানি। নৈরাশ্যের মধ্যেই কবিতাটির সমাপ্তি হলেও মাঝখানে কবির মনে প্রসন্নতার এক অমল স্পর্শের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে ; 'বর্ষশেষ' কবিতার এই বৈশিষ্ট্যটুকু কবির অন্যান্য নৈরাশ্যপীড়িত কবিতার মধ্যে নিশ্চয়ই উল্লেখ্য বলে মনে হবে। হঠাৎ ফুল-ফোটা দেখে কবির

মনে হল পত্রবিরল গাছের অন্তরালে
কোন্ চরণের সোনার নূপুর বেজে বারেক নাম-না-জানা তালে
লুকিয়ে গেল ধরা পড়ার আগে ;
রোমাঞ্চিত হল শরীর কিসের অনুরাগে।
জানি না সে স্বপ্ন কিনা ; কিন্তু যদি স্বপ্ন ব'লেই মানি,
নয় কি আরও অসার স্বপন আর বছরের শুকনো মালাখানি?

'প্রতর্ক' কবিতায় কবির নিজস্ব প্রত্যয় প্রাধান্য পেয়েছে—মানুষ কি শুধু সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে বেঁচে থাকবে ?

উন্মথি সুখের স্মৃতি সর্বনাশ' যেই হলাহল
সৃষ্টি করে সুরাসুরে জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে,
ত্রিভুবনে
সে-বিষের জ্বালা হতে নেই নেই কাহারও নিস্তার।

(প্রতর্ক)

যে ভ্রমান্ধ, সে কেবল অধীর হয়, অনন্তের প্রকৃতিকে বুঝতে পারে না।

শুধু আস্থা আর সহিষ্ণুতা,
সৃষ্টির রহস্য মাত্র এই দুটি সনাতন কথা॥ (তদেব)

এই বোধ-ই কি মানুষকে উজ্জীবিত করে রাখবে ? মানুষের সংস্কারে, চৈতন্যের তটে—এই ধারণাই কি শেষ ? কবির বৈদান্তিক মন এই তর্ক মেনে নিতে পারে না, সব কিছুকেই মায়া মনে হয়—

যদিও বা ক্লান্ত বুদ্ধি মাঝে মাঝে তর্কে দেয় সায়,
তবু মোর উপজ্ঞা গভীর
জানে স্থির
অনন্ত, অমৃত তব মায়া, মিথ্যা মায়া।
সম্ভবত তার চেয়ে সত্য এই অতীতের ছায়া॥

(তদেব)

সুধীন্দ্রনাথের কালচেতনা প্রখর ; যদিও তিনি ক্ষণবাদী, বর্তমান-ই তাঁর

কাছে সব, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ-ও নেই, তবু মহাকালের কাছে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। কালের কাছে ত' কারুরই এবং কিছুরই অব্যাহতি নেই। রক্তলোভাতুর দিগ্বিজয়ীর দুর্বার শকট যেমন সব কিছু মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলে যায়, মহাকালও তেমনি মানুষের কীর্তিস্তম্ভসম্বলিত সাম্রাজ্য ফুৎ-কারে উড়িয়ে দেয়। কালের দুর্বার আক্রমণ সকলকে নিশ্চিহ্ন করে. তার অমোঘ দৃষ্টি থেকে পালাবার কোনো উপায় নেই, এই পুরানো কথাটুকু অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে, অনবদ্য অলঙ্কৃত ভাষায় 'কাল' কবিতায় পরিবেশন করা হয়েছে। কাল কীর্তি গ্রাস করে, জীবনকে গ্রহণ করে, যা-কিছু বস্তুবিশ্ব—সব কিছুকেই ধ্বংস করে, মানুষ মনের মণি-কোঠায় যে স্মৃতির সৌরভটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে—কালের কবল তাকেও গ্রাস করতে দ্বিধা করে না।

কবি এক এক সময়ে নিজেকে বড় নিঃস্ব এবং একা মনে করেন,কালের কাছে সামান্যতম করুণার ভিখারী হয়ে প্রার্থনা করে কবির স্মৃতিকণা-টুকু যেন কাল ধ্বংস করে না দেয়, এবং এই করুণ অসহায় মিনতিটুকু কি অপূর্ব কবিত্বের সঙ্গেই না বর্ণিত হয়েছে—

স্তব্ধ রাতে
শোকাবহ শিশিরসম্পাতে
মোর ফণিমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীষ
এ-বিস্মৃত মরুভূর অনামিক কোণে,
ধ্বংসসার, দুর্গম নির্জনে,
তাতেও তোমার লোভ, তাতেও তোমার প্রয়োজন ?
সর্বস্বান্ত কৃপণের শেষ সঞ্চয়ন
ওই কটা মূল্যহীন, নিরানন্দ, কণ্টকিত স্মৃতি।
চৌদিকে বিরচি এই সহজাত বৃতি
মেয়াদ কাটায় বিশ্বে ম্রিয়মাণ অহমিকা মম।
ক্ষমো, ওরে ক্ষমো,
ওটুকু স্বত্বেরে আজ দাও অব্যাহতি। (কাল)

'ভাগ্যগণনা' কবিতাতেও তিনি কালের অমোঘতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে তাঁর শত্রু হচ্ছে মহাকাল।

বুঝিলাম মোর শত্রু নয়
দুর্হৃদ মানুষ কিংবা কুটিল দেবতা,
শত্রু নয় নিষ্ফলতা, শত্রু নয় আবশ্যিক ব্যথা,
শত্রু শুধু নিরপেক্ষ কাল,
মহাকাল,
ভয়াল, বিশাল॥

(ভাগ্যগণনা)

'জাদুঘর' কবিতাতেও দেখা যাবে মহাকালের জঠরে সবই গ্রস্ত হয়, লয় পায়।

মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই জাদুঘরে
রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে॥

(জাদুঘরে)

এই প্রসঙ্গে আর একবার 'অর্কেস্ট্রা'র 'পুনর্জন্ম' কবিতাটি স্মরণ করা যেতে পারে। কালের অমোঘ বিনাশী শক্তির কথা কবি স্বীকার করেছেন, কালের কাছে কারুরই পার পাবার উপায় নেই—

নিমীলিত নেত্রে দেখি আমি
মহাকাল হস্তচ্যুত, অপ্রচুর অন্তিম নিমেষ
ক্ষণে ক্ষণে হয় নিরুদ্দেশ
প্রতিধ্বনিপূর্ণ বিস্মৃতির অতল পাতালে॥

(পুনর্জন্ম, অর্কেস্ট্রা)

'প্রশ্ন' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনার আংশিক পরিচয় যে নেই —এমন নয়, কিন্তু আর্ত পীড়িত জনসাধারণের হয়ে তিনি একটি প্রশ্ন তুলেছেন ভগবানের কাছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মানুষ দুঃখ কষ্টে সান্ত্বনা লাভ করে থাকে, ঈশ্বরের কল্যাণময় ক্ষেমঙ্কর রূপের সাধনায়

মানুষ দুর্ভাগ্যের পীড়ন সহ্য করে। কবির সংশয় জাগে ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপ বুঝি ভীরু মানুষের কল্পনালোকের স্বপ্নমাত্র, কারণ দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনানত অন্তরে সভক্তি চিত্তে যে প্রতিকার চাই —তা ত' পাই না, তাই কবির সংশয়াপন্ন প্রশ্ন—

ভগবান, ভগবান, রিক্তনাম তুমি কি কেবলই ?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই ?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ?

(প্রশ্ন)

সাধারণ মানুষের কল্যাণে ঈশ্বরের কি দান ? কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছে ; ঈশ্বর কি শুধু যাযাবর বা এই দেশে আগন্তুক আর্যদেরই একান্ত আপনজন ? ঈশ্বরের অমিত ক্ষমা কি শুধু অসুরের জন্যেই ? যারা প্রহরে প্রহরে অকাতরে অতি মূল্য প্রাণ দান করেছে—তারা কেন অবজ্ঞার পাত্র ?

যারা প্রহরে প্রহরে
উৎসর্গিছে অকাতরে অতি মূল্য প্রাণ
সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরলোকে সিংহাসন তব,
তারা অবজ্ঞার পাত্র ?
তারা নয় আত্মীয় তোমার ?
যারা সব ত্যজি,
আপন ধমনী ছেদি সিঞ্চিয়াছে রুক্ষ মরুভূমি
অঙ্কুরিতে সোনার স্বপন,
নাই তাহাদের দাবি ও-কৃপণ করুণাকণায় ?

(প্রশ্ন)

এই পৃথিবীতে, মরলোকে প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে যারা পরাজিত, ক্ষত বিক্ষত—পরলোকে তারা কি জয়ী হবে ? বৈকুণ্ঠের সেই জয় তাদের কি মঙ্গল করবে ? ঈশ্বরের স্মারক স্তম্ভে অমর অক্ষরে তাদের নাম

লেখা থেকেই বা কি লাভ হবে? সে অমৃতে তাদের লভ্য কি?— পৃথিবীর জলবায়ু রৌদ্রছায়া, সিদ্ধি ও সাধনা কি তারা তখন ফিরে পেতে পারে? এত সব প্রশ্নের পরেও তিনি ভগবানের কাছে দাবি করার সুরে প্রশ্ন রাখেন—

অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে?
আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ
নও তুমি নাম মাত্র;
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান?

(তদেব)

'বিরাম' কবিতায় তদানীন্তন কলকাতার একটি বাস্তব ছবি আঁকা হয়েছে, সেই বাস্তবতার মধ্যে বেঁচে থাকাটাই শুধু কবির কাছে সত্য মনে হয়েছে।

'কুক্কুট' কবিতাটিও ঈষৎ ভিন্ন রসের, কুলীন পক্ষীজগৎ যখন স্তব্ধ থাকে, তখন প্রাগূষায় অদৃশ্য, অসংস্কৃত অন্ত্যজের মাভৈ বাণী কবির কাছে অভ্যর্থিত হয়, কবি কুক্কুটকে অভিনন্দন জানান—

রুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক আভিজাত্য ল'য়ে,
তুমি ধরো, হে অস্পৃশ্য, অখ্যাতের সহজ প্রণতি॥

(কুক্কুট)

রুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি কি রবীন্দ্রনাথ? কেন এই সন্দেহ— সে কথায় পরে আসছি।

এই কবিতাটি পাঠকের কাছে সুধীন্দ্রনাথের মানসলোকের একদিককার খোঁজ খবরের সন্ধান এনে দিয়েছে। পীড়িতের জন্যে, বিপর্যস্তের জন্যে, জীবন-যুদ্ধে পরাজিতের জন্যে তাঁর মনে সমবেদনার অভাব ছিল না, পূর্বে আলোচিত 'প্রশ্ন' কবিতাও সে কথার সাক্ষ্য বহন করেছে। এ সব স্বীকার করেও 'কুক্কুট' কবিতা রচনার প্রসঙ্গটি পাঠকের গোচরী-

ভূত করি।

কবির অনুজ শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন যে 'কুক্কুট' কবিতাই সুধীন্দ্র-নাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা, 'প্রবাসী'তেই বের হয়। 'পরিচয়' পত্রিকা বের করার পূর্ব মুহূর্তে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়, রূপ ও প্রকরণ নিয়ে কিছু তর্ক হয়। "বিষয় গৌরবের মূল্য কবিতার ক্ষেত্রে গৌণ, এমন অভিমত প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে সুধীন্দ্রনাথকে বললেন, তাহলে মোরগের ওপর কবিতা লেখ তো, দেখা যাক কিরকম উতরোয়। সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কবিতা হবেই এবং সে-কবিতা আপনার বিচারে উত্তীর্ণ হবে, আশা রাখি।

কয়েকদিন বাদে সুধীন্দ্রনাথ 'কুক্কুট' নামে একটি কবিতা লিখে রবীন্দ্র-নাথের কাছে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হাজির হলেন।···রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়লেন, আবার পড়লেন। প্রশান্তিতে তাঁর মুখ ভরে উঠলো। 'না, তুমি জিতেছ'—রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং নিজেই প্রবাসী পত্রিকায় কবিতাটি পাঠিয়ে দিলেন প্রকাশের জন্য।" (উত্তরসূরী, নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের লেখার অংশ বিশেষ।)

'ক্রন্দসী'র অনেক কবিতারই—যেমন 'প্রার্থনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'সন্ধান' প্রভৃতি আগেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তরফাল্গুনী

'উত্তরফাল্গুনী' প্রেমের কাব্য, এতে উনিশটা কবিতা আছে। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল হলো ১৩৪৭ সাল। কবির স্মৃতিভাণ্ডারে বর্ণরাগরঞ্জিত ও ছলাকলাসম্পৃক্ত প্রেমের যে অভিজ্ঞতা জমা হয়েছিল—কবি আরবার তাকে মনে করে পাঠকের কাছে হাজির করলেন এই গ্রন্থে। 'অর্কেস্ট্রা'র কবিতার মতো এখানেও কবির অভিজ্ঞতা সমন্বিত প্রেমের বিষয়েই উচ্চারণ, তবে যেহেতু 'উত্তরফাল্গুনী'র কবিতা কবির পরিণত মনের রচনা, তাই 'অর্কেস্ট্রা'র ব্যক্তিগত প্রেমের দুঃখ-সুখের তীব্রতা বেশী হলেও ফেনা কম, স্মৃতি-আতুরতা মনের গভীরে যে বৃত্ত রচনা করেছে, কবি এখানে শুধু সেই বৃত্তপথের নির্দেশ করেছেন। 'অর্কেস্ট্রা'য়ও স্মৃতি আছে, সে স্মৃতি রঙীন, বর্ণাঢ্যতায় খুব উজ্জ্বল, তার বর্ণসমাবেশে চোখে ধাঁধা লাগে, সে প্রেম বেশীদিনের পুরোনো হয় নি; কিন্তু 'উত্তর-ফাল্গুনী'র প্রেম স্মৃতির রোমন্থন, যে প্রেম ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় জমে জমে পুরোনো হয়ে পড়েছে, তবু তার স্মৃতি এখনো মনের ভাবলোক দখল করে থাকে, চেতন মনে বেদনার ছোঁয়া এনে দেয়, বুঝি স্বপ্নের হিল্লোলও রচনা করে! কবি এখন যৌবনের দিন অতিক্রম করেছেন, তবু বিগত যৌবনের হারানো সুখের অনুবর্তন এখনো তাঁর সম্বল : এখানে প্রেমের স্মৃতিরঙ উজ্জ্বল থাকলেও তা যে বহুদিনের—অতীত নাট্যের এক দৃশ্য-পটের অভিনীত স্বপ্নবিশেষ—কবি সে কথা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়ে-ছেন এই গ্রন্থে।

'উত্তরফাল্গুনী'তে দেহের মত্ততা এবং দেহসুখের ক্ষণিক মোহকে কবি স্বীকার করে নিয়েছেন, এর আগের গ্রন্থেও কবি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ সুরে, ঈষৎ অনুচ্চকণ্ঠে সেই মোহের কথা ঘোষণা করেছিলেন, এখানে বেশ স্পষ্ট ভাবেই তিনি সোচ্চার হলেন। 'ডাক' কবিতার কথা মনে

পড়ছে। এই কবিতাটির শুরু 'অর্কেস্ট্রা'র সুরের অনুরণনে ; কবির স্মৃতি-আতুর বেদনাময় উপলব্ধির ছবিতে কবিতাটির শুরু, দেহজ ভোগের পূর্ণতার রমণীয় প্রশান্তির পর নায়িকাকে নতুন করে স্মরণ করার আর্তি, সামান্য নারীর দেহ-সৌন্দর্য ও কমনীয়তার মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদ কবি পেয়েছেন, সেই স্মৃতি-চারণার মধ্যে কবি অনুতাপ করেছেন, কেন সেই শান্তিকে তিনি ক্ষণিকের সামগ্রী ভেবে হারিয়ে ফেললেন। দেহের দয়ায় যে সত্য মিলেছিল—তাকে চিরন্তন বলে না মানার মূঢ়তার জন্যেই কবি যেন আজ বিচলিত বোধ করছেন! জীবনের যে মুহূর্তটুকু সুখে শান্তিতে মুখর—তাকে মেনে নিয়ে, তাকে সঞ্চয় করে আনন্দ-মঞ্জুষায় অক্ষয় করে রাখার পক্ষে কবির একটা প্রচ্ছন্ন ওকালতি লক্ষ্য করা যাবে।

তবু নৈরাশ্যপীড়িত সুধীন্দ্রনাথের মনে যে অন্ধকার, হতাশা, তারও প্রতিফলন রয়েছে এখানে। নারীর লাবণ্য ও সৌন্দর্য নিতান্ত জৈবিক—তাকে অমৃত ভেবে পুঁজি করে রাখার মূঢ়তা কবির নেই ; যৌন জাদু নিমেষে নিঃশেষ হয়, কিন্তু মোহের মধ্যে থাকলে সাধারণকেই যে সামান্য বলে মনে হয়। কিন্তু দেহের উত্তাপের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়—

> হয়তো তাই তোমার অনাদরে
> আজিকে আমি হই না বিচলিত ;
> শিখেছি ঠেকে ব্যর্থ ভালোবাসা,
> কালের কাছে অতনু পরাজিত॥

(নিরুক্তি)

'উত্তরফাল্গুনী'র একক বৈশিষ্ট্য এমন কিছু নেই, 'অর্কেস্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী' রচনার সময়ে লেখা কবিতাবলী দিয়েই 'উত্তরফাল্গুনী'র অর্ঘ্য। তাই প্রেমের অনিত্যতার কথা এখানেও ঘোষিত হয়েছে —'দুঃসময়' কবিতাটি স্মরণ করা যাক। প্রেমের চিরন্তনতা কবি বিশ্বাস করতেন না, জৈব আকর্ষণই নায়ক-নায়িকার মিলনবাসনার কারণ, কিন্তু সে মিলনও

ক্ষণিক, তাই নায়ক যদি নায়িকাকে স্বপ্নাশ্রয়ী করতে চায়—তা ব্যর্থ হতে পারে। প্রেমের সুধাভাণ্ড যে নারীর হাতে দেওয়া যায়—সে যে মোহিনী মায়ারই কায়ারূপ। তবু মানুষের ট্র্যাজেডী এই ধ্বংস জেনেও, ক্ষণিক মোহের তুচ্ছ উৎস জেনেও নারীকে সে চায়, বিধাতাকে অলীক ভেবেও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে যেন নায়িকাকে কাছে পাওয়া যায়। কবি জানেন প্রেম চিরকালীন নয়, নায়িকার সঙ্গে মিলনের ক্ষণও দীর্ঘস্থায়ী নয়; কবির তাই মনে হয় যে তিনি যে লগ্নে নায়িকার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, সেটা শুভ মুহূর্ত নয়, সে ক্ষণ হলো অশ্লেষার রাক্ষসী বেলা, সেটা দুঃসময়। সেই দুঃসময়ের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটবেই, সেই বিচ্ছেদের ছায়া কবি প্রকৃতিতে পর্যন্ত প্রতিবিম্বিত দেখেছেন—

> বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অম্বরে,
> তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশ মুকুরে।
>
> (দুঃসময়)

আগের গ্রন্থদ্বয়ে আমরা যে নায়িকার দেখা পেয়েছি, এই গ্রন্থের নায়িকাও সেই নারী, ছলনাপটু বহুবল্লভা—স্বভাবের কোনোরকম পরিবর্তন নেই। মিলনের মাধ্যমে দৈহিক ক্ষুন্নিবৃত্তির কথাও আছে, পূর্ণতার ও প্রসন্নতার কোনো পবিত্র চেতনার বাণী নেই এখানে। কবিও নৈরাশ্য-পীড়িত, মৃত্যুকে তিনি নিশ্চিত বলে এখানে জেনেছেন। প্রেমের চিরন্তন অমল রূপেরও সন্ধান পান নি, তাই জৈব ক্ষুধার চরম বোধই বুঝি প্রেমের উৎস কিংবা পরম ফলশ্রুতি।

ফাল্গুনের উন্মাদনার পর, যৌবন-বয়সের উল্বণ আশ্লেষের সমাপ্তিতে—মন যখন থিতিয়ে পড়ে—তখন মাঝে মাঝে অতীত উন্মাদনার দিনগুলির কথা স্মরণপথে উঁকি মারে, যাদের নিয়ে কবির মধুরাত্রি যাপন হয়েছিল, সেই সময় আজ বহুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, ফাল্গুনের রসোন্মাদনার অবশেষ—ফাল্গুনীর সুখসমাপন ঘটে গেছে, তবু কবির মনে সেই সুখের স্মৃতি, সেই উজ্জীবনের রোমন্থন—তাই এই গ্রন্থের নাম 'উত্তরফাল্গুনী'।

'অর্কেস্ট্রা'-য় রবীন্দ্রনাথ সুরুচির অভাব লক্ষ্য করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাতে অবিচলিত থেকে কোনো কবিতার কোনো অংশই বাদ দেন নি, বদলান নি, ঐ গ্রন্থে যতটুকু অশালীনতা ছিল বলে রুচিমান পাঠকের মনে হবে—তার চেয়ে ঢের বেশী স্পষ্ট বা উন্মোচনশূন্য উক্তি রয়েছে 'উত্তরফাল্গুনী'র কয়েকটি কবিতায়, যেমন 'ডাক', 'দ্বন্দ্ব', 'নিরুক্তি' 'জাগরণ' প্রভৃতি।

'ব্যবধান' কবিতায় কবি বললেন—দৈহিক সুখই প্রেমের পরম লক্ষ্য : দেহগত মিলনেই প্রেমের সর্বস্বতা, রূপে নয়, সৌন্দর্যের অনুধ্যানে নয়, কথায় নয়, শুধু দৈহিক সুখ সম্ভোগেই প্রেম পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে : সনাতন অন্ধকারে নিঃসঙ্কোচ জৈবধর্ম পালনার্থে নায়িকা অনির্বচনীয় তনু যখন সম্প্রদান করছে নায়কের কাছে, তখন সুখের উপলব্ধিতেই চরম প্রেমের পূর্ণতা ! ভোগসর্বস্ব নায়কের তৃপ্তি দেহকে ঘিরে, কিন্তু নায়িকার মনকে বোঝবার চেষ্টা যে নায়কের নেই—এমন নয়, কিন্তু নায়কের কাছে নায়িকা দেহের সর্বস্ব দান করেও ধরা দেয় না, নায়কও বুঝতে অক্ষম যে সেই দেহদানে প্রেমের কোনো প্রতিফলন আছে কিনা। তাই নায়িকার উষ্ণ সান্নিধ্যে নায়ক থাকেন মৌন হয়ে সৌজন্যের ঘটাটোপটাই জেঁকে বসে, মনের গভীরে সূক্ষ্ম অদৃশ্য এক আড়াল থেকেই যায়।

> যে-দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
> মোদের বিয়োগধর্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
> স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।
> তুমি চাও মোর মুখে, আমি তব মুখ পানে চাই :
> এই ভাবি বুঝিলাম, এই ভাবি কিছু বুঝি নাই॥

(ব্যবধান)

'নিরুক্তি'কে 'অর্কেস্ট্রা'র কবিতা বললেও ভুল হবে না। উত্তরযৌবন নায়ক তার গতদিনের প্রেয়সীর কথা স্মরণ করছেন। নায়িকা নায়ককে ভালবাসে না—তাতে নায়কের দুঃখ নেই। ক্ষণ-সম্ভোগের রঙীন আবর্তে

অবলীন বলেই প্রণয়কে তিনি ভেবে নিতে পেরেছেন, তাই জন্মাবধি প্রেমবিনিময়কৃত্যে বেশ কিছু সময় এবং অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়েছে, বিবিধ নারীরও সমাগম ঘটেছে প্রণয়-পটভূমিতে—

এ-ভুজমাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে,
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল নিয়ে নরকে চ'লে গেছে ॥

(নিরুক্তি)

তাই প্রেমের চিরন্তনতায় কবির দ্বিধা জাগে, ভালোবাসার ব্যর্থতাই সত্য, প্রেমিকার অনাদরই অমোঘ।

হয়তো তাই তোমার অনাদরে
আজিকে আমি হই না বিচলিত ;
শিখেছি ঠেকে ব্যর্থ ভালোবাসা,
কালের কাছে অতনু পরাজিত ॥

(নিরুক্তি)

নৈরাশ্যও আছে 'উত্তরফাল্গুনী'-তে ; প্রথম কবিতা 'শর্বরী'-তেই হতাশার কথা, হেমন্তের রিক্ত রূপের কবি হিসাবে সুধীন্দ্রনাথকে অনেকেই চিহ্নিত করে থাকেন। 'শর্বরী' কবিতায় শুষ্কতার, জীর্ণতার, শূন্যতার, নৈরাশ্যের প্রতিফলন রয়েছে। 'মৌনব্রত' কবিতায়ও নৈরাশ্যের ছায়া ; প্রেমিকার কাছে আত্মকথা বলার বাসনা নৈরাশ্যের অন্ধকারে হারিয়ে যায়, যাযাবর কালের লুণ্ঠনে তাঁর সব ঋদ্ধি লুপ্ত হয়।

তবে নৈরাশ্য অপেক্ষা 'উত্তরফাল্গুনী'তে প্রেমের স্মৃতিচারণা, নায়িকার দেহ-সৌরভের ক্ষণস্থায়িত্ব—যা কবির প্রিয় ভাবনা—সেই বিষয়ের কবিতাই বেশী। মৃত্যু-ভাবনা বিষয়ে যে ক'টি কবিতা আছে, 'দ্বন্দ্ব', 'মহানিশা', 'মরণ-তরণী', 'বিলয়' প্রভৃতি—সে সম্পর্কে আগেই বলেছি। আগের গ্রন্থদ্বয়ের কথাই এখানে পুনরাবৃত্ত।

'প্রতিদান' কবিতার নায়িকা বহুবল্লভা, তার সত্রে প্রতিদিনই বহু উপ-

বাসীর ভিড়, জীবনে বহুদিন থেকে বহুভাবে বঞ্চিত নায়ক তবু মাঝে মাঝে প্রেমের প্রশান্তি লাভ করেছেন, 'শাপ ও আশিস, সুধা আর বিষ' একত্রে বিধি তাকে দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বিশীর্ণ জীবনের সড়কে, চারদিকের নির্মমতা ও শূন্যতার মধ্যে নারীর সুষমাই কবিকে তৃপ্তি দেয়—

সেই বিভীষিকা ছায়ার সমান
ফেরে অহরহ রূপের পাছে,
বহুবার তার আকার, প্রকার
ব্যক্ত হয়েছে আমার কাছে।

(প্রতিদান)

নারীর ভালবাসা চিরস্থায়ী না হোক, হোক স্বল্পকালীন—তবু কিছু সময়ের জন্যে তৃপ্তি দেয়, শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করে—

তোমার প্রাণের পরতে পরতে
যে-অনাম তৃষ্ণা গুমরি কাঁদে,
অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
ঝংকৃত আজ সে-অনুনাদে।

(তদেব)

এই তৃপ্তির বিনিময়ে কবি সেই ক্ষণিকাকে প্রেমের স্বর্গে স্থাপিত করবেন—

মোর অসাধ্যসাধনে, মানবী,
নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে ॥

'জাগরণে' আবার কবি বলতে চেয়েছেন প্রেমের উপলব্ধিতে দেহের কি ভূমিকা। এখানে মিলনের নিবিড়তার কথা বলতে গিয়ে কবি নায়িকার তনুদেহের নগ্ন সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, কবির তন্ময় রূপমুগ্ধতার কথা আছে। 'তমিস্রার আবিল প্রপাতে' তাঁর সব স্বপ্ন ডুবে যায়, মন্থর কালের স্রোতে সর্বনাশ শুধু স্তূপীকৃত হয়।

'মাধবী পূর্ণিমা'য় দেখি নায়িকা ক্ষণিকা, তবু সেই ক্ষণিকার রূপমুগ্ধতা

নিয়ে কবি তৃপ্ত হতে চেয়েছেন, তিনি শাশ্বতীকে চান না, কল্পনায় স্বর্গ-সুধা পানের জন্যে ব্যাকুল নন, মর্ত্যের গৃহকোণে নায়িকার সঙ্গ সুখেই তাঁর পরিতৃপ্তি।

'প্রশ্ন' কবিতায় তিনি জানতে চেয়েছেন নায়িকা তাঁকে সত্যিই ভাল-বাসেন কিনা—নানা বিন্যাসেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। দু' একটি কবিতায় ঈষৎ বৈচিত্র্যের কথা রয়েছে, যেমন 'অহৈতুকী' কবিতায় একাকীত্বের অনুভূতি রূপ পেয়েছে—

> মনে হয় একা আমি।—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে
> পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে।
>
> (অহৈতুকী)

'জন্মান্তরে' ঈষৎ ভিন্নতা দেখা গেল। কামুকতা নেই, অসীম স্থৈর্যে নিজের কামনাবাসনাকে বেঁধেছেন কবি; তিনি অরতিকে ডেকেছেন—

> নামুক অরতি অতএব মোর শরীরে,
> কামনার বানে বাঁধ বেঁধে দিক ধৈর্য,
> আত্মবোধের অন্তরতম অরিরে
> হানুক মৃত্যু মহানিদ্রার স্থৈর্য।

সংবর্ত

'সংবর্ত' কবি সুধীন্দ্রনাথের পরিণত মানসের কাব্যগ্রন্থ ; 'উত্তরফাল্গুনী' প্রকাশের তেরো বছর পরে 'সংবর্ত' ১৩৬০ সালে প্রথম বের হয়। এখানে কবির ব্যক্তিক চেতনায় রাষ্ট্রচিন্তা কি সাংঘাতিক রকম নাড়া খেয়েছে, তার পরিচয় আছে। তিনি নিজেও বলেছেন যে তাঁর লেখায় "আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।" তাঁর মননে বিশ্বরাজনীতির মঞ্চাসীন নায়কের ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত প্রভাব ফেলেছে ! তাঁর অন্তর্মানসে রাষ্ট্রচিন্তা শুধু ছায়া ফেলে নি, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফ্যাসিবাদের উত্থান, নাৎসী নেতার অভ্যুদয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম—সবই তিনি দেখেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলের যেমন টুঁটি নেড়ে দিয়েছে, তেমনি প্রাচীন জীবনবোধগুলিরও আবার নব মূল্যায়ন ঘটিয়েছে ; তাই সাধারণ মানুষের জীবনচিন্তায় প্রচণ্ড রকম জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞে মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার ভিৎ নড়বড়ে হয়েছে। স্বার্থলোলুপ রাষ্ট্রশক্তির কপটতায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা ; কবির মনেও এই নৈরাশ্যময় পরিস্থিতি কবিকে সচকিত করে তুলেছে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন, তাঁর বেদনা-জর্জর ক্ষোভের কিছু প্রকাশ আছে 'সংবর্ত' গ্রন্থে।

অবশ্য 'অর্কেস্ট্রা'র শীর্ষনামের কবিতায় তিনি বিশ্বজীবনবীক্ষায় এই বেদনা প্রকাশ করেছেন—মহাদেবের প্রলয় নাচের রূপকে—'আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,/পায়ে তাণ্ডব জেগে উঠেছে।' 'সংবর্তে'র কবিতাবলীতে তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন চারিদিকে ধ্বংসের মর্মন্তুদ রূপ, শুনলেন, রাজনীতির কূট কৌশলী কপটতায় অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ।

এই গ্রন্থে কবি যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশী সজ্ঞান হয়েছেন, এবং বিশ্বযুদ্ধ যে মানুষের কাছে এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়—সে সম্পর্কে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইলো না। যুদ্ধ প্রলয় মেঘের আকারে দেশের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

'সংবর্তে' সুধীন্দ্রনাথের মানসে বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিচয় থাকলেও, তিনি পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় নিজের মনে প্রবল অস্বস্তি বোধ করলেও জাগতিক সুখদুঃখের প্রতিও তিনি মনোযোগী হয়েছেন। 'সংবর্তে' তাঁর মনের নিঃসঙ্গতা এবং সমসাময়িক কালেরজাগতিক ঘটনাবলী তাঁকে কিভাবে পীড়িত করেছিল, তারই প্রকাশ রয়েছে। সভ্য জগতের সভ্যতর ঘটনাবলী কবির পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল, ধীরে ধীরে তিনি সভ্যতার আশ্রয় থেকে কতকটা নিজের অজান্তেই যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁর আশা ছিল দুঃখের রাত্রির শেষে উজ্জ্বল প্রাভাতিক অরুণোদয়ে অন্ধকার দূর হবে, দুর্যোগ কেটে যাবে, যুদ্ধের এই ক্ষয়, ধ্বংস ব্যর্থ হবে না, কিন্তু কবির সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে। সভ্যতার এই মলিন রূপ দেখে, বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত হয়েছেন, আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছেন, বিশ্ব তাঁর কাছে বিরূপ ঠেকেছে, সেখানে মানুষমাত্রেই নিয়ত একা, নিঃসঙ্গ।

কবির কাজ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মননে জাতীয় জীবনের প্রতিফলিত রূপের পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব কবি মাত্রেরই থাকা উচিত। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা। কিন্তু আপন কালের স্বধর্ম ভুললেই, সে-সমন্বয় সহজ হয় না, যিনি উক্ত সংগমের দিকে এগোতে চান, নিজের জাতিগত চৈতন্যকে, প্রতীকরূপে দেখতে তিনি বাধ্য। এই ধরনের মতের পোষকতার জন্যেই তিনি জাতীয় জীবনের পটভূমিতে বিশ্ববীক্ষা করেছেন।

'সংবর্তে'র কবিতাবলীতে দেখি বিশ্বজীবনের বিশ্লেষণ তাঁর মানসিকতায়

এবং স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে যে ভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তারই নূতন প্রচ্ছায়া। তাঁর ব্যক্তিগত মননে, চিন্তায় এবং উপলব্ধিতে জাতীয় চেতনার প্রক্ষেপ উত্থাপিত করেছেন তিনি। সেই দায়িত্ব থেকে কবি মুক্তি নেন নি, অন্তত 'সংবর্তে'র কবিতাবলী সে রকম সাক্ষ্য দেয় না। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের রাজনৈতিক বিপর্যয়ে যে বেদনা ও বিহ্বলতা বোধ করেছেন, সার্বিক চেতনায় তাকে তিনি প্রতিফলিত করলেন —'সংবর্তে'।

এক হিসেবে 'সংবর্ত'কে আশাভঙ্গের কাব্য বলা চলে। কবি আশা করেছিলেন পৃথিবীর কল্যাণ হবে, সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা ঘুচবে, স্থায়ী শান্তি কায়েম হবে। কবি সেই মুগ্ধ প্রত্যাশায় দিনাতিপাত করছিলেন, সেই সুখের উপযোগী গান রচনার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু সে আশা ত' ফললো না—সে বুঝি শুধু স্বপ্ন-

বুঝি তারা শুধু কুজ্ ঝটিকার চাতুরী :
তবু তুলনায় ধন্ধ জাগায় মাথুরই ;
প্রতীকপ্রতিম তাদের কাস্তে, হাতুড়ি
ফসল মুড়ায়, মানমন্দির পেষে।
মূর্ত নিষেধ, মূক নির্বেদ
তাকায় নির্নিমেষে॥

(নান্দীমুখ)

বামপন্থী চিন্তার মানুষই বুঝি বর্তমান জগতের মুক্তিদাতা হতে পারে, তেমন চিন্তাও কবি করেছিলেন—চীনে কিংবা স্পেনেও সে ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু তাও আজ ব্যর্থতার ঘোষণা এনে দিয়েছে।

সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি,
পশে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন ;
অথচ তাদের চিনি। (তদেব)

মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করতে হবে, তাকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা দিতে হবে, বিশ্বে শান্তি আনতে গেলে প্রথম শর্ত হবে মানুষের অধিকার সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ভাল-বাসার হাত বাড়াতে হবে, মারণঅস্ত্রে ভয় দেখিয়ে তাকে দমন করলে কোনোদিনই পৃথিবীতে শান্তি আসবে না, আগে মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হতে হবে, নচেৎ শান্তির বুলি শুধু কাপট্যের ভণিতা হয়ে দাঁড়াবে।

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে ;
নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,
ভরে রবে বাসী শবে।

(তদেব)

বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবি ব্যথিত হচ্ছেন, চারিদিকে অশুভ শক্তির উদ্বোধন এবং দানবী তাণ্ডবের অত্যাচারে পৃথিবী কাতর। ইওরোপে আরব্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনের শিখা এশিয়ার শান্ত জীবনকেও গ্রাস করছে, যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি হয়েছে, মন্বন্তর ও অনাহারেও কত মৃত্যু হচ্ছে—এর প্রতিকার কি ? কবি মহামানবের কাছে প্রার্থনা জানান—কেন তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটে না, নির্জিত নিরু-পায়ের আর্ত কণ্ঠস্বরের প্রার্থনা কি তাঁর কানে পৌঁছচ্ছে না ? দুর্বৃত্ত মতলববাজ দস্যুর করাল গ্রাসে কত শত অসহায় মানুষ বিনাদোষে প্রাণ হারিয়েছে।

এই সময়ে মানবত্রাতা কি অদৃশ্য অনাভির্ভূত থাকবেন ? কবি তাঁর কাছে প্রশ্ন করছেন—এই পরিণতির জন্যেই কি তিনি দুর্বৃত্তের মূঢ় ঔদ্ধত্যের কাছে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন ?

এই পরিণতির লোভে কি
জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে,
কণ্টককিরীট প'রে, বিনা ধনুর্বেদে

হলে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট,
মৃত্যুর কবাট
খুলে রেখে, চ'লে গেলে সার্বজন্য সুধার সন্ধানে,
আশ্রিতের কানে
সাম্য-মৈত্রী-তিতিক্ষার বীজ মন্ত্র ঢেলে,
মিয়াদী প্রদীপ জ্বেলে
পণজীবী প্রতীক্ষার অনন্ত অভাবে ?

(উজ্জীবন)

আকাশে বাতাসে আজ কার ঘোষণা, কোন্ অশুভ শক্তির আবাহন-গান ? আজ দীপ্তনখ, স্ফীতনাসা যে পিশাচী চমূর দল চতুর্দিকে চক্রব্যূহ রচনা করছে—ওরা যার হোতা, যে পশুবলের কাছে হার মেনে মহা-মানব মৃত্যুঞ্জয় বলে পূজার্হ—

এ-বারে কি তার উজ্জীবন ?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিল সংগোপন
যে-মিসরী শব,
তুমি নও, আসে সে কি অর্ধ-পশু, অর্ধেক মানব
সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু ?
পুরাণ পুরুষ হত : বাজে বক্ষে আর্তির ডমরু॥

(তদেব)

সুধীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা পোষণ করতেন, এ কথা উদাহরণসহ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, তবু বিদেশী কিছু allusion যে তাঁর কাব্যে নেই—এমন নয়। 'জেসন্' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। গ্রীক-পুরাণের একটি বিশিষ্ট চরিত্র জেসন্।

সুধীন্দ্রনাথ নিজের নৈঃসঙ্গ্য এবং একাকীত্বের আর্তির প্রকাশে জেসনের জীবনের একাংশের কথা স্মরণ করেছেন, জেসনের সংগ্রামশীলতার তীব্রতাকে মনে রেখেছেন, কিন্তু জেসনের সাফল্যের সঙ্গে নিজের অদৃষ্টের

কোনো মিল দেখেন নি, এখানেই তাঁর নৈরাশ্য।
জেসনের কাহিনীটা খুব সংক্ষেপে একবার স্মরণ করে নিলে কবিতাটির বেদনার খেই ধরতে অসুবিধা হবে না। থেসালির রাজার ছেলে জেসন, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ছোট ভাই পেলিয়াস রাজা হন, জেসন্ রাজত্বের দাবি নিয়ে দাঁড়ালে পেলিয়াস বললেন যে জেসন্ যদি কোলচিসের রাজা এঈটসের কাছ থেকে সোনালি পশম নিয়ে আসতে পারে—তাকে নিশ্চয়ই রাজ্য ছেড়ে দেবে পেলিয়াস। সোনালি পশম আছে ওক গাছে ঝোলানো আর তার পাহারায় রয়েছে সদাজাগ্রত এক দুর্ধর্ষ ড্রাগন।
জেসন্ রাজী, আর্গো জাহাজে চেপে কিছু গ্রীক বীরসহ সমুদ্রে পাড়ি জমালেন। প্রচণ্ড দুঃসাহসিক অভিযানের পর এঈটেসের কাছে পৌঁছলেন। এঈটেস সোনালি পশম দিতে চাইলেন একটা শর্তে। শর্তটা বড় মারাত্মক। তামার পা-ওয়ালা অগ্নিনিঃশ্বাসী দুটো ষাঁড়ের সাহায্যে জমিতে লাঙল চষে জেসন্ যদি ক্যাডমাসের দ্বারা নিহত এক ড্রাগনের দাঁত বপন করতে পারে, তবেই সোনালি পশম তাকে দেওয়া হবে। জেসনকে দেখে এঈটেসের মেয়ে মিডিয়া তাকে ভালবেসে ফেললো, এবং জেসন্ তাকে বিয়ে করবে বলে কথাও দিলেন। মিডিয়ার যাদুশক্তির সাহায্যে জেসনের পক্ষে ঐ অসাধ্য কাজ করা সম্ভব হলো; মিডিয়া পাহারারত ড্রাগনকে জাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে ফেললে এবং জেসনের পক্ষে সোনালি পশম নিতে কষ্ট হলো না; তারপর রাজকোষ থেকে প্রচুর ধনরত্ন আত্মসাৎ করে মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে জেসন্ আর্গো জাহাজে চেপে স্বদেশে ফিরে স্বরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন—অবশ্য মিডিয়াকে বিয়ে করে।
জেসনের দুঃসাহসিকতা ও ভাগ্যান্বেষণ—সবই কবির কাছে নৈরাশ্যে অবসিত হয়েছে, যদিও গ্রীক-পুরাণে এই হতাশা নেই। সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু সর্বনাশকেই নিশ্চিত বলে জানলেন, একাকীত্বের বেদনাই বড় হয়ে বাজলো—

ফলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আজ আমি ;
অন্তর্যামী
সাধ ও সাধ্যের ভেদ গোলায় কেবলই।
ঘটে অন্তর্জলি
শতচ্ছিদ্র তরণীতে ; কিন্তু ভাবি অকূল পাথারে
স্বেচ্ছায় চলেছি ছুটে ; বস্তুত জোয়ারে
ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই ভাঁটাতে।

(জেসন্)

'সংবর্তে'র এই কবিতাটি যখন লেখেন—তখন থেকেই তাঁর সকল স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে, তাই ভাঙা হাল ধরে থেকে জীবনতরীতে ছেঁড়াপাল সযত্নে খাটিয়ে অস্মিতার দাবি প্রতিষ্ঠাকে অর্থহীন বলে ভেবেছেন—

স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা ;
জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা
বিজিগীষা।

(তদেব)

'জেসন্' কবিতায় মাঝে মাঝে রূপকের ছলে পরস্বাপহরণকারী বিদেশী বণিকদের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে ; যেমন—

হাহাকারে ভরে রাজপুরী
তার উগ্র রিরংসায় ; অভিসারী ঝড়ে
সবিতার বুলি লুটে, পলাতক তরীতে সে চড়ে॥

(তদেব)

'সংক্রাম' শূন্যতার কবিতা, নঞর্থক দর্শনই এর প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রেম যত সত্যই হোক, বিরহ তার অন্তিমে। তবু মানুষ সেই বিরহ পার হয়, দুর্গম পথের সাহায্যে। সংক্রাম হচ্ছে দুর্গম পথ। বিশ্ব অনাথ ও ধ্বংসশীল, সেখানে মরুভূমির সমভাব নিত্য বিরাজমান। মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু তার অবদান চিরস্থায়ী হলেও তাকে চলে যেতে হয়, তাই বিচ্ছেদ

ঘটে 'ব্যাজজীবী কালের কবলে।'

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে হতাশ হয়ে বুদ্ধিজীবী লেখক এবং শিল্পীদের একদল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন—যাতে মানুষের শান্তি এবং কল্যাণ হয়। সুধীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদে তিতবিরক্ত হয়েছেন, সাধারণ সাম্যবাদকেও তিনি একনায়কবাদেরই নামান্তর বলে ভেবেছেন, তাই সাম্যবাদী প্রথায় তাঁর বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে, তিনি 'কাস্তে' কবিতায় ব্যক্ত করলেন—সাম্যবাদী চিন্তায় সত্যকার শুভ নেই, সাম্যবাদ 'কুজ্-ঝটিকার চাতুরী' ছাড়া আর কিছু নয়। এ যুগের চাঁদকে কাস্তে বলে যতই গলা ফাটানো হোক না কেন—আসলে ঐ চাঁদ ছায়াপথে পলায়নতৎপর অশরীরী উন্মাদ ছাড়া কিছু নয়।

'সংবর্তে'র মুখবন্ধে কবি বলেছেন যে তাঁর কবিতায় আধুনিক যুগ ও জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা আছে। 'সংবর্ত' '১৯৪৫', 'যযাতি' প্রভৃতি কবিতায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। 'সংবর্ত' নামের কবিতায় যুগচেতনার পরিচয় আমরা পাই। তবু এই কবিতার শুরু এবং সমাপ্তিতে কবির প্রাতিস্বিক স্মৃতি-চেতনা অনুপস্থিত নয়। কবির বয়স চল্লিশোত্তর, ঈষৎ মেদস্ফীত, গলকম্বলের থর মুকুরের অধিকাংশই জুড়ে বসে—এমন বয়সেও বৃষ্টির দিনে কবির নায়িকাকে মনে পড়ে, সে-ও যেন কালের বলি :

> রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে
> লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোলপ্রধান
> প্রাক্‌প্রচ্ছদ নটী যেন।

(সংবর্ত)

ধীরে ধীরে কবির মনে পড়ে বর্তমান যুগের সঙ্কট, আত্মচিন্তার পরি-প্রেক্ষিত ছেড়ে বিশ্ববীক্ষাই তাঁর মনকে পেয়ে বসে। 'সংবর্তে' গোটা পৃথিবীর সমকালীন ইতিহাস কবিকে কেমনভাবে বিচলিত করেছে,

তার পরিচয় রয়েছে, এবং আত্মচিন্তার মাধ্যমে জাগতিক সমস্যাবলীকে তিনি পাঠকের গোচরীভূত করেছেন।

মানবেতিহাসে মলমাস যে মাঝে মাঝে আসে, এবং ইতিহাসে তার স্বাক্ষর থাকে—কবি তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী—যেখানে 'ব্যোমযান, কামান, পদাতি' অনুপস্থিত 'ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি যার মুখ্য অবলম্বন'—সেই পৃথিবী শুধু ঈপ্সিতাই থেকে গেল।

> অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী ঃ
> রুধের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
> হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিট্লারের সুহৃদ্ স্টালিন,
> মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
> কবন্ধ ফরাসী দেশ।

(তদেব)

এই যখন অবস্থা, তখন স্মরণের পথে উঁকি দেয় একটি বিষণ্ন চিন্তা, কবির প্রাক্তন প্রেয়সীর কথা হঠাৎ মনে পড়ে, প্রশ্ন জাগে—'সে এখনও বেঁচে আছি কি না'—এর উত্তরে কবি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। বিশ্বব্যাপী প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে প্রেম দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যে নারী কবিকে সুখী করার চেষ্টা করেছিল—আজ তার কথা স্মরণ করে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন।

'সংবর্তে'র বিরহকাতর নায়ক বিশ্বপরিক্রমার পরেও আর্তনাদের সুরেই ঘোষণা করেছেন—'সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি, চূর্ণমুষ্টি ধূলি ধূসরিত'। জগৎ অলীক—এই বোধ সুধীন্দ্রনাথের ছিল, তাই কোথাও অন্যায় হচ্ছে—এ তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল, তাই প্রেমের অনির্বচনীয়তার স্বীকৃতি অপেক্ষা দেহোপভোগের স্বাদুতাকে তিনি সহজেই মেনে নিতে পারতেন। এই জন্যেই 'সংবর্তে' জগৎব্যাপী দুর্যোগকে দেখেও তিনি ব্যক্তিগত বেদনার কারণটিকে কম করে দেখতে পারেন নি, বিশ্বরাজ্যের প্রলয়জনিত দুর্যোগকে প্রাতিস্বিক দুর্যোগের পটভূমিতে স্বীকার করে নিতেন। আর ব্যক্তিগত সেই স্বীকারোক্তির মধ্যে সার্বজনীন একটা

আর্তির স্বর শোনা যেত।

'১৯৪৫' শীর্ষক কবিতায় আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে। কবি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধের পর মানুষের কল্যাণ হবে, এত প্রাণ বলি, এত হাহাকার ব্যর্থ হবার নয়। নাৎসী পিশাচেরও মৃত্যু ঘটবে, আসবে শান্তি, মানুষের জয় হবে। কবির এই আশা ও বিশ্বাস ফলে নি ; পৃথিবীর সর্বত্র রাজনৈতিক চেহারায় মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন অসহায় প্রতিফলিত হলো, শান্তি আজ নিরাশ্রয়, অনিকাম। শান্তির জন্যে মানুষ এমনই ব্যাকুল প্রত্যাশায় ছিল—

> এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
> দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে ;
> কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
> মেদিনীমুখর এক নায়কের স্তবে !

(১৯৪৫)

যুদ্ধ এবং বিপ্লব বিপুল সংখ্যক মানুষকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে, তাদের মৃত্যুর বিনিময়ে পৃথিবীতে কোনো কল্যাণ আসে নি, ভারতবর্ষেও না। বরঞ্চ বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক দুর্যোগে ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্যের বীজ উপ্ত হয়েছে, আত্মবিধ্বংসী অনৈক্যের জোয়ার বয়েছে—

> স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,
> জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে।

(তদেব)

বিশ্ব-সঙ্কটের এই ক্রান্তিকালে দেশের রাজনৈতিক দুর্দশাও কবিকে ব্যথিত করেছে, তারই স্পষ্ট দলিল এই '১৯৪৫' কবিতাটি।

'সংবর্তে'র মুখবন্ধে তিনি 'বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক' বলে নিজেকে ক্ষণবাদী দর্শনের তকমায় চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সমকালে ঘটে-যাওয়া তাবৎ রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লব ও বিবর্তনগুলি তাঁকে

কেমন বিচলিত করেছে—তার পরিচয় রয়েছে 'যযাতি' কবিতাতে ; 'সংবর্ত', '১৯৪৫' প্রভৃতি কবিতাগুলির মতো এটি ভাঙাগড়ার পট-ভূমিতে তাঁর মানসিক বোধের কবিতা। বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী তিনি শুধু দেখছেন মাত্র, নিরপেক্ষ কালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্ষণবাদিত্বের দৃষ্টিতে তিনি শুধুমাত্র দর্শক—এমন একটা ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ বলে দেখিয়েছেন বটে, (মুখবন্ধে তাই বোধহয় তিনি আগেভাগে নিজেকে ক্ষণবাদী বৌদ্ধ বলে পরিচিত করিয়ে নিয়েছেন।) কিন্তু 'যযাতি' কবিতাটি তাঁর উপলব্ধি-লোকেরই নির্যাস। বহির্জগতের ঘটনার শুধু নিরপেক্ষ দ্রষ্টা তিনি নন, এই ঘটনার ভাঙাগড়ার সঙ্গে তার বোধ ও বেদনার তন্ত্রীগুলিও যুক্ত হচ্ছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের মারণযজ্ঞে ফ্যাসিবাদের নগ্ন দস্যুতাকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি, ফ্যাসিবাদ পল্লীর শ্যামশোভায় এনেছে মরুভূমির রুক্ষতা, নগরকেও করে তুলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব।

আশ্রুত তারক
অন্যত্রও অনাগত ; জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচরঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে।

(যযাতি)

দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হানাহানি, ধ্বংস-প্রতিধ্বংসের প্রতিযোগিতার দূরত্বে সমুদ্রের ব্যবধান—এ আজ আর কোনো বাধাই নয়।

প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর
মানা। নৈশ হানা, আত্মঘাতী অঙ্গীকার, বিচারের
সম্মত বিকার বা স্বস্থ ধিক্কার এড়িয়ে যে যায়
ভাগ্যগুণে, চোখে চোখে তাকে অদৃশ্য শকুনে
প্রবাসেও অহরহ ঃ যথাকালে অমৃতের দায়

সাশ্রু সন্ততিকে সঁপে, অন্তিম শয্যায় নিকামত
পারে না আশ্রয় নিতে ; ঊষর ধূলিতে নিষ্পিষ্ট সে,
ইতিহাসনিষ্ক্রান্তও বটে। অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্ব ঘটে ; এবং প্রৌঢ়ের কেন, সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ ॥

(তদেব)

বিংশ শতাব্দীতে সর্বাত্মক ধ্বংসের দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ কবি দেখলেন, ভয়াবহ পরিণতি দেখে তিনি বিপন্ন হলেন, রাজনীতির দিক থেকে মানুষের জন্যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো না, সে বেদনাও কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরের ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

(তদেব)

'সংবর্ত' এবং 'যযাতি' কবিতাদ্বয়কে আত্মগত উক্তির নাট্যকাব্য বলা যেতে পারে। লিরিক কাব্যের পেলবতা অপেক্ষা নাট্যীয় সংহতি এই কবিতাদ্বয়ে খুব বেশী রয়েছে। শব্দ ব্যবহারের ইঙ্গিতধর্মিতার সঙ্গে ছন্দের গাম্ভীর্যটুকুও পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। বক্তব্যের গভীরতা এবং কায়া-গঠনের স্ফটিক-স্বচ্ছতা লক্ষ্য করেই বোধহয় কবি অরুণকুমার সরকার 'সংবর্ত' গ্রন্থকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এবিষয়ে কিছু পত্রবিনিময়ও হয়েছিল। 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটিতেও বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা রয়েছে। তবে এখানে বিশ্ব রাজনীতির কথার সঙ্গে কাব্যিক সৌন্দর্যের কোনো

হানি ঘটানো হয় নি। ছন্দের খাতিরে, অভাবিতপূর্ব মিলের দৌলতে কবিতাটির পাঠ্যতাগুণও অতুলনীয় বলা চলে। 'প্রত্যাবর্তনে' কবি বিশ্বের সার্বত্রিক ঘটনা সম্পর্কে সজ্ঞান, পেনাং ও চীন থেকে শুরু করে ফ্রান্স, স্পেন, লণ্ডন পর্যন্ত এমনকি ইস্তান্‌বুল এবং সর্বশেষে সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর ব্যাপারটিও তাঁর স্মরণে উদিত। যুদ্ধ লিপ্সার পর জেতা ও বিজিতের মিলনের ফাঁকিটুকুও কবির দৃষ্টি এড়ায় নি, হিরোশিমা নাগাসাকির অসহায় ট্র্যাজেডির বেদনা তিনি ভুলতে পারছেন না—

অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত,
ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি ঃ
বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত,
পরিত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসাকি।
জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যক্ষে
সুপ্রতিষ্ঠ অনুকরণীয় সখ্যে ;
প্রত্যাখ্যান তবু সংবৃত চক্ষে,
কক্ষলগ্ন প্রকোষ্ঠে নেই রাখি।
উলঙ্গ রামা-সহ য়োকোহামা ;
বিদেশী নাবিক মাতাল এবং অপরিণত ॥

(প্রত্যাবর্তন)

দশমী

কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ হলো 'দশমী'। এতে দশটি কবিতা আছে, সেই কারণে এই গ্রন্থের অনুরূপ নাম বলে সমালোচক মহলে যে ধারণা আছে, আমি তার সাথে একমত নই। বরং এটি যদি কবির দশম কাব্য গ্রন্থ হতো, তাহলেও তবু 'দশমী' নামের ঈষৎ সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেত।

প্রাচীন কোকশাস্ত্রের একটি হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থে 'দশমী' শব্দটির একটি বিশিষ্ট অর্থ নির্ধারিত রয়েছে দেখা গেল। একটা দুর্ধর্ষ যৌবনের অধিকারী পুরুষের কামপ্রবণ চিত্তের তুরীয় দশম অবস্থাকেই দশমী বলা হয়েছে। আবেগে ও উত্তেজনায় নায়ক যখন সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে সম্বিৎ বিসর্জন দেন—তখনই তার দশমাবস্থা বলা চলে ; অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত গতচেতন মানুষই হচ্ছে দশমদশাপ্রাপ্ত। তখন তার পুনর্বাসের জন্যে তাকে আবার নূতন জীবন চেতনায় দীক্ষিত হতে হয়।

'দশমী' গ্রন্থেও দেখা যাবে নায়ক যৌবনাবেগের উত্তেজনাশেষে নিজের মনকে জানবার চেষ্টা করছেন, তিনি প্রতীক্ষা করছেন—নব জীবনের জন্যে, কিন্তু নৈরাশ্যের অনিবার্য অমায় তাঁকে ঘিরে ধরেছে, শূন্যতা এবং নৈঃসঙ্গ্যের অসহায় কারুণ্য থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি!

'দশমী'র মধ্যে বিষাদখিন্ন রিক্ত ও বিচ্ছিন্ন জীবনের সুরটি খুবই স্পষ্ট। এখানেও জগৎ কবির কাছে বিরূপ বলে মনে হয়েছে। তিনি একাকীত্বের বেদনাই বহন করে চলেছেন ; যৌবন, উল্লাস এবং সমৃদ্ধি—সবই আজ অবসিত। জীবন সম্পর্কে কবির যেন কোনো আশা নেই। তিনি ক্লিষ্ট বোধ করেছেন, জীবন তাঁর কাছে নৈরাশ্যের চিত্রই রচনা করে গেছে, তাই জীবনের সম্বলবাহী সাধের তরণী হয় ভ্রষ্ট না হয় মগ্ন। এক হিসাবে 'দশমী'ই সুধীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্যতম বই, কেননা, এর সব

কবিতাই প্রায় বিমূর্তভাব নিয়ে লেখা। কবি এখানে নিজের সত্তার যথার্থ পরিচয়টুকু লাভ করার সাধনায় ব্রতী। তাছাড়া কয়েকটি কবিতায় প্রতীকী রূপারোপের মাধ্যমে কবির অন্তশ্চৈতন্যেরও পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা হলো 'প্রতীক্ষা'। সেখানেও নৈরাশ্যের সুর প্রকট। পাতা-ঝরানো বনে কার পদপাত শোনা যায়? আর ত' কোনোদিন যৌবনশক্তির উজ্জীবন ঘটবে বলে মনে হয় না, তবু কেন শীতান্তে পলাশের ঔজ্জ্বল্য?

চারিদিকেই নৈরাশ্য, সংসারেও সুখ নেই। অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে সংসার আমাদের কাছে 'অনাদি অমাকে' এনে হাজির করে; প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার ডোরে পারস্পরিক স্নেহ, প্রীতি ও মমতার সন্নিধ ডোরে আমরা বাঁধা পড়ি, তবু 'মানবেতিহাসে সর্বনাশেরই দেশনা'। 'পৃথিবী অনাথ', তাই পরিত্রাণের জন্যে কেউ এগিয়ে আসে না, মৃত্যুই অমোঘ হয়ে দেখা দেয়, তাই কবির স্থির প্রত্যয় জাগে যে 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'।

প্রৌঢ়জীবনে আত্মসম্বিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি উপলব্ধি করছেন যে স্বধর্মে অবিচল থাকাই শ্রেয়; 'অনাদি অমা' আমাদের ঘিরে ধরে। জীবন প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে পীড়িত হয়, তবু নিজের অন্তশ্চৈতন্যের স্বরূপ দেখার জন্যে কবি প্রতীক্ষা করে থাকেন। নিজেকেই খুঁজছেন তিনি। 'ক্রন্দসী'তেও আমরা সন্ধানরত কবির রূপ দেখেছি, সেই কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিটি এখানে আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে—

সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে॥

(সন্ধান, ক্রন্দসী)

'নৌকাডুবি' কবিতাটিতেও কবির ব্যক্তি-জীবনের নৈরাশ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। রূপকাশ্রিত এই কবিতাটির বাইরের ছবিতেও ঔজ্জ্বল্যের অভাব লক্ষিত হবে। 'কবিতা-পরিচয়' কাগজের চতুর্থ সঙ্কলনে (শ্রাবণ,

১৩৭৪) বুদ্ধদেব বসু প্রতিটি শব্দ ব্যবহারের কারণসহ এই কবিতার একটি ব্যাখ্যা দান করেছেন। সবশেষে তিনি বলেছেন যে "কবির অন্তর্জীবনের একটি নাটক এটি।...'নৌকাডুবি'-তে এমন একজনের কথা বলা হয়েছে যে কোনো আকস্মিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কিছু-দিনের জন্যে কোনো সৃষ্টিকর্মে (সম্ভবত কবিতা লেখায়) সাবলীল-ভাবে ব্যাপৃত ছিলো; কিন্তু যখন বেলা পড়ে এলো, তখন সে দেখলে যে 'কিছুই সহজ নয়; কিছুই সহজ নেই আর।' তার অনুভূতি হলো যেন পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে; এই জন্যেই প্রান্তর হলো সমুদ্র, পান্থ নৌজীবী, আর তরণীটিও মজ্জমান, কেননা বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য।"

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে রুক্ষ প্রকৃতি, মরুভূমির ছবি, প্রান্তরের ধূসর শূন্যতা যেমন আছে, তেমনি তরণীর চিত্রও খুব বেশী আছে। নৌচালনাকে কবি বিশেষ কৃতিত্বের বলে ভেবে থাকবেন। তাই নৌবিদ্যার গুণপনায় তিনি আত্মজৈবনিক বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করতে পারেন; তাঁর বহু কবিতায় তরী এবং তরণীচালকের কথা আছে—তার উল্লেখ অন্যত্র করা হয়েছে। তবে যেহেতু তাঁর চিন্তা নৈরাশ্যের অমায় আশ্রিত, তাই তাঁর নৌকা তীরে ঠেকে নি, ডুবেছে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না গিয়ে 'ভ্রষ্টতরী' কিম্বা 'মরণতরী' হয়েছে, অর্থাৎ নৌচালনায় দক্ষতা থাকলেও সাফল্য নেই, তরী হয় মগ্ন, নয় ভ্রষ্ট, না হয় অন্যভাবে বিপন্ন, 'নৌকাডুবি'তেও সেই নৈরাশ্যই ধ্বনিত হয়েছে।

এবার 'অগ্রহায়ণ' কবিতা। হেমন্তের রিক্ত প্রকৃতির ছবি—কবি জীবনের শূন্যতারই আর এক রূপান্তর, যেহেতু 'দশমী' গ্রন্থে নায়ক জীবনের এক নতুন তাৎপর্য-সন্ধানে রত, তাই তাকে আমরা দেখি যে নৈরাশ্যরিক্ত জীবনের শূন্যতায় দাঁড়িয়েও ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যের আস্বাদে এক নতুন তাৎপর্য খোঁজায় যেন ব্যস্ত;

> ঘুম নেই তবু রুদ্ধ চোখে :
> শিথিল সন্ধিতে জাড্য, ধমনীতে হিম ;

কিন্তু সে, এখনও অন্ধ অস্তমিত সূর্যের আলোকে,
বোঝে না স্বভাবদোষে রাত্রির কৃত্রিম
বররুচি অক্ষয় অশোকে ॥

(অগ্রহায়ণ)

'ভ্রষ্টতরী' কবিতায় কবি খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে উদ্দেশ্য-হীন তাঁর তরী, নিরবলম্ব বিশ্বে সে চলেছে, তাতে আজ আর স্বপ্ন নেই, স্মৃতিও নিঃশেষ, সর্বনাশের দিকে তার অবাধগতি। আগের কবিতার মতো এখানেও দেখি এই শূন্য জীবনে কবির ইন্দ্রিয় চেতনাই কবিকে নতুন একটা ইঙ্গিত এনে দিয়েছে, জীবনের রিক্ততা থেকে মুক্তি পাবার পথ ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যানুভবের মধ্যে মিলতে পারে।

অন্ধ আলোর পলাতক পরমাণু
অমারাতে তাকে ছায়াপথে মিছে টানে ॥

'তীর্থপরিক্রমা'য় কবির অতীতচারী রোমান্টিক স্বপ্নের নৈষ্ফল্যই তাঁর সমবেদনার কারণ হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৎপর সৌন্দর্যস্বাদ গ্রহণের ব্যাকু-লতা এখানে কিন্তু অনুপস্থিত।

ভ্রাতৃরক্তে যে এদেশের মাটি সিক্ত—তা ভোলা গেল না, মাঝে মাঝে এখানেও আপাতদৃষ্টিতে শ্যামশোভা দৃষ্ট হলেও আসলে সে রূঢ়তারই নামান্তর, কেননা মায়ায় ঘেরা তা, অস্থিসার গিরি তুষার কিরীটী হতে পারে কিন্তু কখনো ত' তা শান্তির আগার নয়। অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা বিগতশক্তি ক্ষত্রিয় যেমন তপোবল লাভের ব্রতসাধনায় মত্ত থাকে—কেননা প্রতিহিংসাবৃত্তি তার তখনো সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয় নি ; তেমনি দেশের মাটি রক্তস্নাত হলে হবে কি, এখনো পিপাসা ও ক্ষয়ের বাসনা অটুট আছে বীতবল ক্ষত্রিয়ের প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছার মতোই !

যৌবনকালে যে উৎকর্ষসাধন ব্রত—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা—এই ছটি, পারমিতার অবশ্য অনুষ্ঠানের তপস্যা ছিল—তা ত' চক্রচর কালের কল্যাণে ফলপ্রসূ হয় নি। কল্যাণকামীর শক্তি এবং

অশুভবুদ্ধির শক্তি সমান, এখানে ভালো ও মন্দের দাপটও সর্বসম ; রোমান্টিক স্বপ্নচারীরা সে কথা মানে না, কবিও আগে এই সত্য স্বীকার করেন নি, ফলে আজকের নিষ্ফলতা তাঁকে পীড়িত করছে, অন্তশ্চৈতন্যের আহ্বান বুঝি আর শোনা যাচ্ছে না। ফণিমনসার বনেই বুঝি সে চেতনা হত হলো, তাই বুঝি এখন 'এ-মরুর অস্থ অবসাদ' দুর্বিষহ ঠেকছে !

'ভূমা' কবিতাটির মধ্যে কবির দার্শনিক সত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তিনি ক্ষণবাদী, অতীত তাঁর কাছে বর্তমানের স্মৃতিমাত্র, ভবিষ্যৎকেও বর্তমানের স্বপ্ন বলে জ্ঞান করেন—

পরিপূর্ণ বর্তমান : নাস্তিসুদ্ধ তার অংশভাক্ ,
ভূত অধুনার স্মৃতি, উপস্থিত স্বপ্ন ভবিষ্যৎ ;
পরিপ্রেক্ষিতের বশে অনেকান্ত প্রত্যক্ষ জগৎ ;
দেশান্তর ভাবচ্ছবি ; ক্রৌঞ্চ, কবি অভিন্ন, অবাক্ ॥

(ভূমা)

এক ঝাঁক নেতিবাচক প্রশ্ন কবির মনকে ঘিরে ধরলেও বাইরের সৌন্দর্যময় প্রকৃতির ছবি দেখে মানুষ তৃপ্তি পায়, ক্ষণকালীন রমণীয়তার মাধুর্যেও মন যে আকৃষ্ট হয়—এ সত্য কিন্তু কবি অস্বীকার করতে পারলেন না—

সবুজের স্বরগ্রাম ফাল্গুনের রৌদ্রে হিরণ্ময়,
সংগত সে-ঐকতানে অসম্পৃক্ত আমের মুকুল ;
হলুদে চিত্রিত লাল, জনপদবধূর দুকূল
সংবৃত রূপের সাক্ষ্য : অন্তরাত্মা পর্যন্ত তন্ময় ॥

সে-চির মুহূর্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যাত্ত মুখে,
যার সারথ্যে ও সখ্যে ক্লৈব্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী :
শষ্পশ্যাম কুরুক্ষেত্রে অবিচল নিত্যের সমাধি ;
অনুপূর্ব সম্রাটেরা ধূলিসাৎ তাল ঠুকে ঠুকে ॥ (তদেব)

তবে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি বলেছেন যে অনাথ বিশ্বে মানুষ অসহায়; সৌন্দর্য তাকে যতটা বিভ্রান্ত করে, ততটা তৃপ্তি দেয় না।

সূর্য আঁকে মরীচিকা ; মদস্রাবে মজায় চন্দ্রমা ;
বিগত রশ্মির প্রেতে কণ্টকিত অসম্ভূত অমা।
কী দেখে দিগন্তরালে ফিরে ফিরে আশ্লিষ্ট প্রেয়সী ?

(তদেব)

নিজের শক্তির প্রতিও তার আস্থা থাকে না, যে জ্ঞানের আলো তাকে পথ দেখাবে, তাও অমায় আচ্ছন্ন—তখনই সে নিজেকে বিনষ্ট ভাবে।

তাই কি নিমেষমাত্র সর্বময় সংবিদের আয়ু,
এবং কালের গতি প্লুত ব'লে, তাকে সে চেনে না ?

(তদেব)

কিন্তু নিজের এই নৈঃসঙ্গ্য জেনেও ইন্দ্রিয়ঘন চেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে চায়—

অবচেতনায় পরস্পর সম্ভোগের দেনা
স্বাক্ষরিত হতে থাকে ; দায়ভাগী জাতিস্মর স্নায়ু ॥

(তদেব)

সুধীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী ছিলেন, 'অর্কেস্ট্রা' কাব্য থেকেই তা দেখা গেছে ; 'উপস্থাপন' কবিতায় শেষবারের মতো তাঁর ক্ষণবাদী বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি, 'সংবর্তে'র সোঽহংবাদী কবি এখানে বলেছেন—

আমি ক্ষণবাদী ঃ অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও।

মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের তাবৎ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ তামাদী হয়ে যায়, সেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জের টেনে যে সংসার চলে—সেই সংসারও। দিনগত পাপক্ষয়ের স্বাক্ষরই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা, সুতরাং

জীবন যখন কালের স্রোতে প্রবহমান, যাত্রাশেষে যখন স্বগত প্রত্যয় ছাড়া অন্য কিছু প্রাপ্তব্য নয়, তখন জীবনের বর্তমান বোধকেই পরম ভেবে মননে উপস্থাপিত এবং উপলব্ধ করাই উচিত।

অধুনার
সাক্ষাৎ মাভৈ ঐকান্তিক বটে, কিন্তু বর্তমানে
দূর স'রে আসে স্বত সন্নিকটে, ইতিহাস প্রাণ
পায় ভাবচ্ছবিরূপে, অন্তরীক্ষ মণ্ডূকের কূপে
ঝাঁপ দেয়, আদায়ের সমে ফেরে জন্মান্তের ব্যয়।

'প্রত্যুত্তরে'ও কবির নঞর্থক জীবনচিন্তার প্রকাশ। যদিও তিনি 'স্বগত' গ্রন্থের 'পুনশ্চ' প্রবন্ধে লিখেছেন যে জীবন তাঁর প্রতি বিমুখ নয়, —কোনো কবিতায় কিন্তু সেকথার প্রতিফলন হয় নি, শেষজীবনের কয়েকটি লেখাতেও তিনি নৈরাশ্যকে আশ্রয় ভেবে আঁকড়ে ধরে আছেন। নাস্তির কিনারা যে অনুত্তার্য—'প্রত্যুত্তরে' সেই ঘোষণার কথা আছে। অসহায় মানুষের অনন্যসম্বল যে সাধের তরণী-তা মজ্জমান। নৌকা অচল হয়, নাবিক পঙ্গু হয়ে পড়ে।

আগামীকাল বিষাবশেষ ক্ষিপ্ত পারাবারে ভেসে ওঠে।
তাকিয়ে থাকে পঙ্গু নাবিক : ভুষণ্ডী কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে॥

'অসংগতি' কবিতায় কবি তাঁর অন্তশ্চেতনার কথা রূপকের আড়ালে বলেছেন। জীবনে মানুষ অনেক সময় নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ চিনেও চিনতে পারে না, নিজের চৈতন্যের কাছে তার বুঝি শরণও মেলে না।

অক্ষয় বট, জানি, আমায় দেয়নি শরণ :
অস্থায়ী নীড়, খড়কুটো তার উপকরণ ;
শুকনো শাখায় ঝুমকোলতার মোহাবরণ ;
আতুর ব'লেই, অলস বিহঙ্গম।

কবি নিজের মননকে, আরো পরিষ্কার করে বললে বলা চলে যে তাঁর চৈতন্যকে এই অক্ষয় বট বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পরা-বাস্তববাদী পাশ্চাত্ত্যদেশের কবিরা বৃক্ষচেতনার প্রতীকে আপন

চৈতন্যকে ব্যঞ্জিত করেছেন। শুধু 'দশমী'তে নয়, কবি আদ্যন্তই প্রতীকী শব্দ ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

'অসংগতি' কবিতায় শেষের দিকে দেখা যায় যে প্রবহমান যে জীবন—কবির আসক্তি তাকে কেন্দ্র করেই; জীবনকে ইন্দ্রিয়াসক্তির লোলুপতায় গ্রহণীয় বলেই কবি স্বীকার করে নিচ্ছেন; ক্ষণবাদী বলেই কি পলায়নতৎপর সৌন্দর্যের প্রতি এই আকর্ষণ?

ম্লান সহসা দুঃস্থ অগৌরবে
বর্তমানের নিত্য অভিজ্ঞানও?
অথচ আজ মজাতে চায় মরীচিকাই;
প্রবঞ্চনা পরিবর্তে প্রজ্ঞা বিকাই:
কালির পোঁছে অনির্বচনীয় নিকাই;
মিসরী বীজ জরায় মরূদ্যানও।
অসম্পাদ্য সম্ভাবনার বিকার অসম্ভবে:
পঙ্গু পাখা ব্যস্ত তবে কেন?

একেই কি কবির অসংগতি বলে মনে হচ্ছে?

'নষ্টনীড়'ও প্রতীক কবিতা। নিরাশ্রয় অনিকেত কবি অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছেন, গতাসু আলোর প্রেতকে তিনি নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে এতদিন বিচরণশীল দেখে এসেছেন; 'দশমী'র শেষ কবিতায় তিনি আশ্রয়ী হতে চেয়েছেন—চেয়েছেন একটি নীড়, দর্শন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর যে প্রজ্ঞালাভ ঘটেছে—তারই আলোয় তিনি নিজের উপলব্ধির ক্ষেত্রটুকু দেখে নিতে চেয়েছেন, নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত মন, অনিশ্চয় বাতাস তার তরণীর পালে দোলা জাগায় না—তবু মন চায় ইন্দ্রিয়ের পথে মুগ্ধতার একটি সুস্থ আশ্রয়, হোক ক্ষণিক, তবু অলস বিহঙ্গমের আর্তিমাখা একটি নীড়। কৃষ্ণচূড়া আশ্রয় দিতে চায় না, নিষেধে মাথা নাড়ে, তবু কবির মন—যাকে কবি শুক বলে বর্ণনা করেছেন—আশ্রয়ের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছে। পরিপেক্ষিত বা পারিপার্শ্বিকও অনুকূল নয়—

চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,
কোথায় যেন নিবিদ বলে যবনে ;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক।

তত্নপরি, পাতাল ভেদ করে অসম্ভূত অমার আবির্ভাব—এই অমা হচ্ছে রিক্ততা এবং নিঃসঙ্গতার অন্ধকার ; কিন্তু কবির মন এই অন্ধকারের কাছে ধরা দিতে চায় না, অন্ধকারকে জ্যোতির্গামী করার সাধনায় মাতে, শুকের পঙ্গু পাখা কি ব্যস্ত হয় অন্ধকারের পারে ক্ষণিক আশ্রয়ের মোহকে লাভ করার জন্যে ? নিঃসঙ্গ একক কবি আলোর প্রয়াসী, দুঃসহ তপশ্চর্যায় ব্রতী। ক্ষণবাদী কবি ইন্দ্রিয়ের পথেই তাৎক্ষণিকের মোহমুক্ত অবগুণ্ঠনে জীবনের প্রমাকে স্বয়ংবর করে নিতে চান ? তবু কেন তিনি ব্যর্থ হবেন ? কেন এই নীড় হবে নষ্ট ?

তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে,
মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা ?

পরিশিষ্ট

[কয়েকটি আপাত দুরূহ শব্দ ও তাদের অর্থ]

অ

অকায়—বিদেহী অবস্থায়, কায়াহীন-ভাবে

অকারী—অকেজো ?

অগুরু—হাল্কা

অঙ্কুট—তীক্ষ্ণ, স্থির, কার্যকর

অঞ্চিত—পূজিত, চারু, বক্রীকৃত, গত, ব্যাপ্ত, গ্রথিত

অনশ্বর—অক্ষয়, যা নশ্বর নয়

অনিকাম—অপ্রচুর (নিকাম—প্রচুর, পর্যাপ্ত)

অনির্বেদ—অবৈরাগ্য

অনীক—যুদ্ধ

অনীকিনী—বল, সৈন্য, অক্ষৌহিণীর দশমভাগ

অনুগ—প্রবেশযোগ্য, সেবক, অনুরূপ, পরিজন

অনুপূর্বপথিকা—যথাক্রমপ্রাপ্ত পথিকা, পর পর পথিক।

[পথিক—শিকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়]

অনুযাত্র—অনুগামী

অন্তম—অন্তকে যে মাপতে পারে, যথা অনন্ত

অপচারী—যার আচরণ দোষযুক্ত

অপেরণে—অপপ্রেরণে ?

অপ্রতর—যা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না

অবস্করে—বিষ্ঠা, আবর্জনা, গুহ

অবিমৃশ্য—সন্দেহের অযোগ্য

অরতি—রাগশূন্য, নিরুদ্যম, অপ্রীতি, মনঃকষ্ট

অরাল—বক্র, কুটিল, কুঞ্চিত, (আড়াল)

অরুন্তুদ—কঠোর, দুঃখদায়ক

অলখ—অদৃশ্য, নিরঞ্জন

অলাত—ঈষৎ দগ্ধ (লাত—গৃহীত)

অসম্ভূতি—অনুৎপত্তি

অস্থ—যা থাকে না, অবর্তমান

অস্মিতা—অস্তিত্ব

অস্ব, অস্বক, অস্বকীয়—পরকীয়

অহনা—দিন (হন—ঘাতক)

আ

আপতিক—আপাত থেকে

আরণ্যিক—অরণ্য থেকে

আরাত্রিক—নীরাজন নিমিত্ত দীপ, আরতি

আস্বচ্ছ—ঈষৎ স্বচ্ছ

উ

উচ্চল—অত্যন্ত চলনশীল

উৎক্রম—ঊর্ধ্বগতি, বিপরীতক্রম, ব্যভিচার

উত্তরঙ্গ—বিক্ষুব্ধ, উল্লোল

উদীর্ণ—উদ্দিত, উৎপন্ন, দৃপ্ত, প্রবল, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
উদ্বায়ী—অপরের দিকে যা ওঠে, ঊর্ধ্বগ
উদ্বেজিত—বিরক্ত, উত্যক্ত
উদ্বেষ্টিত—আবৃত, অবরুদ্ধ
উন্মুদ্র—প্রস্ফুটিত, বিকসিত
উপজ্ঞা—প্রথম জ্ঞান, উপদেশ ছাড়া যে জ্ঞান (instinct)
উরোজ—স্তন
উল্বন—ব্যক্ত, ভয়ংকর

ঋ

ঋষ্টি—গ্রহদোষ, অশুভ

এ

এষণা—অন্বেষণ, প্রেরণা, কামনা

ক

কম্র—কামুক, কমনীয়
কাদম্ব—কলহংস, বালিহাঁস, বাণ, আখ
কামোদ—সঙ্গীতের রাগ বিশেষ, মৃতের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত জল
কার্মুক—বাঁশ, ধনুক, ইন্দ্রধনু
কির্মীর—নানা বর্ণযুক্ত, রাক্ষস বিশেষ
কুম্ভীপাক—নরক বিশেষ
কুলাল—কুমোর, কুকোপাখি
কূট—অসত্য, কপট, পর্বত
ক্রমতুর্ণ—ক্রমবর্ধমান, ক্রমবেগবান
ক্ষামা—ক্ষীণা ; দগ্ধা ? ক্লান্তা ?

চ

চংক্রমণ—বারবার ভ্রমণ, অতিবেগে ভ্রমণ
চীর্ণ—সম্পাদিত, বিদারিত
চীবরে—বস্ত্রে, কানিতে

ঝ

ঝাবুক—ঝাউগাছ

ত

তমত্রস্নু—অন্ধকারভীত
তরক্ষু—নেকড়ে বাঘ, হায়েনা
তুর্ণ—বেগবান
তূর্ণ—লঘু, শীঘ্র
ত্রস্নু—ভীরু, ত্রাসশীল

দ

দিগ্বেদ—দিঙ্‌নির্ণয়
দুরত্যয়—দুরতিক্রম্য, দুস্তর, অপার
দুরাশ—দুর্লভ
দেশনা—ঘোষণা
দেহলী—সিঁড়ে, চৌকাঠ

ন

নিংকামত—অতিশয়রূপে, সাতিশয়
নিবিদ—দেবতাসম্পর্কিত, প্রাচীন বাক্য-বিষয়ক
নিবীত—যজ্ঞসূত্র
নিরতীত—যা চলে যায় না, নিরত্যয়, নির্গমনহীন

নিরাকৃত—আকৃতিশূন্য ?

নিরাকৃত—খণ্ডিত

নিরিক্ত—নিশ্চিতরূপে রিক্ত

নিরুক্তি—কথিত, নির্বচন

নিরুপাখ্য—অনির্বচনীয়

নিরুপাধি—শুদ্ধ, উপাধিরহিত

নির্জিত—পরাজিত, প্রতিহত

নির্বচন—ব্যুৎপত্তি, জনশ্রুতি

নিষ্ফল নৈমিষ—ফলহীন নৈমিষারণ্য

নৈমিষ—ক্ষণিক

নৈরাজ্য—অরাজকতা

প

পরাবর্ত—বিনিময়

পরিগ্রহণ—নেওয়া

পরিপ্লুতি—অভিষেক, সংগমক্লিন্ন যোনির ভাব

পরিভূ—চতুর্দিকে জাত

পরীণাহ—ব্যাপ্তি বা বিশালতা ? ['পরিণাহ' অভিধানে আছে, কিন্তু 'পরীণাহ' নেই।]

পাতী—পতনশীল, নিঃসারণকারী

প্রণাদ—উচ্চ আনন্দধ্বনি

প্রতন—সুবিস্তৃত

প্রতর্ক—তর্কযোগ্য ব্যক্তি

প্রজ্ঞাপারমিতা—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা—এই ছ'টি পারমিতা বা উৎকর্ষের সাধন—বোধিসত্ত্বের অবশ্য কর্তব্য

প্রপঞ্চ—বিশ্ব

প্রপন্ন—শরণাগত

প্রমা—যথার্থ অনুভব

প্রমিতি—প্রমাণ

প্ররোহ—অঙ্কুর, বৃক্ষের ঝুরি

প্রাকাম্য—যথাকাম (অষ্টসিদ্ধির একতম)

প্রেষণা—পাঠানো

প্রৈতি—প্রয়াণ

প্লুত—স্বরের ভেদবিশেষ

ব

বন্দ্র—বন্দনাকারী

বভ্রু—পিঙ্গলবর্ণ

বিকচ—বিকসিত, প্রফুল্ল, কেশহীন। (কচ × কেশ)

বিপর্যাস—ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য

বিবিক্ত—পৃথক, অসম্পৃক্ত, স্বতন্ত্র

বিবিক্তি—নির্জনতা ?

বিবৃত্তি—ঘূর্ণন, ঘোরার ব্যাপার

বিশ্রব্ধ—বিশ্বস্ত, ধীর

বৃতি—বেড়া

বেপমান—কম্পমান

বৈদেহী—দেহহীনা ?

বৈহাসিক—সঙ, বিদূষক

ব্যবধি—আড়াল, দূরত্ব

ব্যবস্থিত—স্থির, নিয়মিত

ব্যাত্ত—প্রসারিত

ভ

ভ্রমিভ্রান্ত—গমনশীলকে ভুল দেখা ? ['উত্তররামচরিতে' এই অর্থে

শব্দটির প্রয়োগ পেয়েছি, কোনো অভিধানে শব্দটি নেই]

ম

মৎসর—কৃপণ, ঈর্ষাপরায়ণ

মাতরিশ্বা—বায়ু, আকাশে বিচরণশীল

মিঁমিরে—আলোকে ?

ল

লহু—লঘু, লোহা, রক্ত

শ

শবল—নানাবর্ণযুক্ত, বিচিত্র, পাহাড়ী-জাতি বিশেষ

শটিত—পচা, শড়া

শয়নী—শয্যা

স

সংক্রাম—দুর্গম পথ

সংবর্ত—মহাপ্রলয়

সংসক্ত—মিলিত, সংলগ্ন, আসক্ত

সন্নিধি—সান্নিধ্য

সার্বজন্য—সর্বজনের নিমিত্ত

সুষির—বাঁশি, বাঁশ, বেত (সুষি—ছিদ্র)

স্বত—নিজে থেকে

স্বৈরবৃত্ত—ইচ্ছামত যা হয়েছে

স্রস্তরা—পতিতেরা ?

হ

হবন—হোম, হোমদ্রব্য